আদায়ের ইতিহাস

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতি প্রকাশন

২২এ, কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রথম বিভূতি প্রকাশন—সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৬৮

প্রকাশক :

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

বিভূতি প্রকাশন

২২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক :

ধনঞ্জয় রায়

মুদ্রণশ্রী প্রেস

১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :

কানাই পাল

ব্লক :

কলার স্টুডিও

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬

মুদ্রণ :

ফাইন প্রিণ্টার্স

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬

বাঁধিয়েছেন :

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওআর্কস

৬১।১, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

একটাকা [illegible] নয়া

॥ এক ॥

বৈশাখ মাসে ত্রিষ্টুপের জন্ম হইয়াছিল। ছাব্বিশ বছর পরে বৈশাখ মাসেই একদিন তার খেয়াল হইল, এ পর্যন্ত জীবনে সে পাওয়ার মত কিছুই পায় নাই।

সে দিনটা তার জন্মদিন নয়। জীবনের সর্বপ্রথম কান্না সে কোন্ মাসে কাঁদিয়াছিল, এটা তার জানা ছিল বটে; কিন্তু তারিখের কোন হিসাব ছিল না। হিসাব থাকিলে জন্মদিনে মানুষ জন্মমৃত্যুর দুর্বোধ্য রহস্যের কথা হয়তো একটু ভাবে, মনের এলোমেলো খাপ্ছাড়া দার্শনিকতার কষ্টিপাথরে জীবনের দাম কষিবার সাময়িক ইচ্ছাও হয়তো একটু জাগে। ওসব সমস্যা নিয়া ত্রিষ্টুপ আজ মাথা ঘামাইতে বসে নাই। সাধারণ হিসাবে এমন কিছু ঘটেও নাই যে, মনটা তার খারাপ হইয়া যাইবে এবং মনে হইবে এ জগতে সবই ফাঁকি আর জীবনটা তার একদম ফাঁকা। আসলে সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া তখন সে সবে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে।

তবে রাত্রে সে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিল। বড়ই খাপছাড়া অদ্ভুত স্বপ্ন। তার ছেলেটি যেন মরিয়া গিয়াছে। ছেলের শোকে সে যেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে আর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব টিটকারী দিয়া তাকে বলিতেছে, তার মত মানুষের কি ছেলের জন্য শোক করা উচিত। স্বপ্নে সে অবশ্য সকলের মনের ভাবটা চমৎকার বুঝিতে পারিয়াছিল। ছেলের শোকে পাছে সে পাগল হইয়া যায় অথবা সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করে, এই আশঙ্কায় সকলে তার শোককে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতেছিল।

উদ্দেশ্য খুব ভালো সন্দেহ নাই। স্বপ্নে সে কারও উপর রাগ করে নাই, শুধু একটু সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল হইয়া শোকের প্রকাশটা আরও জোরালো করিয়া তুলিয়াছিল। কেমন করিয়া সকলকে সে বুঝাইয়া দিবে যে, তারা ভুল করিতেছে, এভাবে তার শোক শান্ত করা যাইবে না; সকলে তার সঙ্গে একটু কাঁদিলেই বরং তার ব্যথা জুড়াইয়া যাইবে, ভাবিয়া স্বপ্নে বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিবার পর সকলের উপর সে একটা তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করিতেছে। স্বপ্ন মিলাইয়াই গিয়াছে স্বপ্নে, এখন শুধু আছে একটা বেদনামাখা বিস্ময়কর ভার-বোধ এবং সকলের নির্মমতার বিরুদ্ধে অভিমান-ভরা নালিশ।

ছেলে তার নাই। এ পর্যন্ত বিবাহ সে করে নাই। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া তার হাসি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নের কথা সে ভাবিতেছে না, স্বপ্নের প্রভাবটা শুধু তার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

তার কেউ নাই। সকলে তার পর। তার কিছু নাই। কেউ তাকে কিছু দেয় নাই।

সংসারের কলরব কানে আসিতেছিল। তাকে বাদ দিয়াই সকলে কলরব করিতেছে। স্বপ্নের মত সে যদি এখন শূন্যে মিশাইয়া যায়, কারও কিছু আসিয়া যাইবে না, এমনি ভাবে কলরব করিয়া চলিবে দিনের পর দিন। এ যে ছেলেমানুষী চিন্তা, ত্রিষ্টুপ তা বুঝিতে পারিতেছিল, কিন্তু উপায় কি! চিন্তাগুলি আজ যেন স্বাধীন হইয়া গিয়াছে, এতদিনের ধরা-বাঁধা পথে শিক্ষিত সৈন্যের মত সংস্কারগত নির্দেশের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে রাজী নয়। এই ধরনের আরও কত চিন্তা কোথা হইতে আসিয়া তার মনে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, সংযত করিবার কোন চেষ্টাই কাজে আসিল না।

সাত বছরের একটি মেয়ে দরজার ফাঁকে ডাক দিয়া চীৎকার

করিয়া বলিল, 'বারোটা পর্যন্ত ঘুমাবে নাকি মামা, বিছানা ছেড়ে উঠবে না ?'

'এদিকে শোন, রাণু ।'

রাণু নির্ভয়ে কাছে আসিল। মামা তাকে বড় ভালবাসে। হয় তো কাল রাত্রে বাড়ী ফেরার সময়ে তার জন্যে কিছু কিনিয়া আনিয়াছে, নয় তো তাকে একটু আদর করিবার শখ জাগিয়াছে মামার। মুখে প্রত্যাশার হাসি ফুটাইয়া রাণু কাছে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র ত্রিষ্টুপ সজোরে তার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল !

'ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে, না ?'

এ তো আদর নয়, রাগের ভানে খেলার ছলে শাসন করা নয়। চমক ভাঙ্গিয়া আঘাতের বেদনায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে রাণুর একটু সময় লাগিল। ততক্ষণে বিছানা হইতে নামিয়া ত্রিষ্টুপ গট্ গট্ করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

একটি ছোট দোতলা বাড়ীর একতলায় তাহাদের অধিকার। ত্রিষ্টুপ ঘুমায় বৈঠকখানায়। দিনের বেলা তার বিছানা ভিতরে টানিয়া আনা হয়, রাত্রে আবার বৈঠকখানায় চৌকিতে বিছানাটি পাতিয়া দেওয়া হয়। ঘরটিতে দোতলার ভাড়াটেদের ভাগ আছে ; দিনের বেলা ত্রিষ্টুপ একা ঘরটি দখল করিয়া থাকিলে তারা আপত্তি করে। সারাদিন একটি লোকও তাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসে কিনা সন্দেহ, তবু তারা সব সময়ে কোন এক অজানা আগন্তুকের প্রতীক্ষা করে এবং কেউ আসিয়া পাছে কিছু মনে করে, এই ভয়ে দিনের বেলা ত্রিষ্টুপের বিছানাটি চৌকীর উপর গুটাইয়া রাখিতেও দেয় না।

উঠানের এক কোণে তার দিদি প্রভা টিউবওয়েলে জল তুলিয়া বড় একটা বালতি ভরিতেছিল, ত্রিষ্টুপকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'রাণু কাঁদছে কেন রে ?'

ত্রিষ্টুপ গম্ভীর মুখে বলিল, 'মেরেছি।'

'কেন, কি করেছিল মেয়েটা ?' কৌতূহলের বশেই প্রভা কথাটা জিজ্ঞাসা করিল, অনুযোগের জন্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া ত্রিষ্টুপ যেন ক্ষেপিয়া গেল।

'অত কৈফিয়তে তোমার দরকার ? খুসী হয়েছে—মেরেছি।'

প্রভা খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ত্রিষ্টুপ তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া রান্না ঘরে গিয়াই দাবী জানাইল, 'আমার চা কই ?'

মা খুন্তি দিয়া তরকারী নাড়িতেছিলেন, বলিলেন, 'এই যে করে দি। এত বেলা করে উঠলি, চা-ই বা খাবি কখন, চান করে খেতেই বা বসবি কখন। ওঁর সঙ্গে তো যেতে হবে তোকে ?'

'না।'

'তোর বুঝি দেরীতে আফিস ? তা হোক, ওঁর সঙ্গেই তুই যা বাবা, প্রথম দিনটা। তিনি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারেন।'

'আমি চাকরী করব না।'

কথা শুনিয়া মা হাতেব খুন্তি উঁচু করিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর পঁচাত্তর টাকা বেতনের এই চাকরীটি জুটিয়াছে, আজ তার ছেলের প্রথম চাকরীতে যোগ দিবার কথা, এখন সে বলিতেছে চাকরী করিবে না। প্রথমটা মা একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। তারপর মনে করিলেন তাই কি কখনও হয় ? ছেলে তার সঙ্গে দুষ্টামি করিতেছে।

'নে, খুব হয়েছে, আর ফাজলামি করে না! প্রভাকে ডাকতো, তোকে খেতে দিয়ে চা'টা করুক।'

গামছা কাঁধে ত্রিষ্টুপের বাবা অবিনাশ তেলের খোঁজে রান্নাঘরে আসিলেন। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'এখন আর চা খেতে হবে না, চান করে ফ্যাল। সাড়ে আটটা বেজে গেছে, ন'টা পঁচিশের গাড়ীটা ধরতেই হবে। আজ ফিরিবার সময় মান্থলিটা করে ফেলিস কিন্তু, ভুলিস না।'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'আমি যাব না বাবা।'

'যাবি না ? যাবি না মানে ?'

'চাকরী করা আমার পোষাবে না।'

অবিনাশ তেলের বাটি হইতে হাতের তালুতে তেল ঢালিতেছিলেন, খানিকটা তেল মাটিতে পড়িয়া গেল। মার হাতের খুন্তি আবার কড়াই-এর অনেকখানি উঁচুতে নিশ্চল হইয়া রহিল।

প্রথম কথা কহিলেন অবিনাশ।—কি বলছিস্ তুই পাগলের মত ?'

এমন সময় রাণুর হাত ধরিয়া প্রভা সেখানে আসিল। রাণুর গালে ত্রিষ্টুপের আঙ্গুলের দাগ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেয়েটা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, ঠিক স্বপ্নে ত্রিষ্টুপের ছেলের শোকে কাঁদার মত। প্রভার মুখ মেঘে ঢাকা আকাশের মত অন্ধকার। মেয়ের গালটি সকলের সামনে ধরিয়া সে বলিল, 'ছাখো বাবা, কেমন করে মেরেছে মেয়েটাকে। বেলা হয়ে গেছে, আজ আবার আপিস যাবে, আমি তাই মেয়েটাকে বলেছিলাম তোর মামাকে ডেকে দে তো রাণু। ও গিয়ে যেই ডেকেছে, অমনি মেরে একেবারে খুন করে দিয়েছে। ওর কি দোষটা ? তোমরাই বল ওর দোষটা কি ? বিশেষ ছ'টি খেতে-পরতে দিচ্ছ বলে—' প্রভা নিজেও ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রভার নালিশ ও কান্না সকলের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, বিশেষ বিচলিত কেউ হয় না। সারাদিনে অন্ততঃ একবার প্রভার নালিশ ও কান্না না শুনিলেই বরং সকলে একটু আশ্চর্য হইয়া ভাবে, কি হইয়াছে প্রভার আজ ? তবে এক হিসাবে প্রভার মন খুব উদার, একটি ধমকেই সে সন্তুষ্ট হয়, কান্না থামিয়া যায়, ঘ্যান-ঘ্যান প্যান-প্যান করে না। কেবল ধমকটা দিতে হয় কতকটা এই ভাবে :

চুপ কর প্রভা, কি বকছিস তুই পাগলের মত ? তুই কি পর এসেছিস্ এ বাড়ীতে, কুটুম এসেছিস্ ?

আজ কেউ ধমক দিল না, কিছুই বলিল না। প্রভা আশ্চর্য হইয়া সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তার মেয়ের গালে চড় মারার চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে বুঝিতে পারা মাত্র কৌতূহলের বন্যায় অভিমান ভাসিয়া গেল।

'কি হয়েছে মা ?'

'হয়েছে আমার অদৃষ্টে আমার পোড়াকপাল !'

কি হইয়াছে বুঝা গেল না বটে, কিন্তু ভয়ানক কিছু যে সত্যই হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না প্রভার। ধৈর্য ধরিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জলভরা চোখের সে দৃষ্টি কামিনী বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন, 'তিষ্টু চাকরী করবে না বলছে।'

'ও, এই ! তিষ্টু ফাজলামি করছে।'

প্রভার স্বামী রমেশের আজ চাকরী নাই তিন বছর, প্রভা ভাবিতেও পারে না মানুষ চাকরী পাইয়াও বলিতে পারে, সে চাকরী করিবে না।

বাপের সঙ্গে এ ধরনের ফাজলামি করা ত্রিষ্টুপের স্বভাব নয়, তবু অথই জলে পড়িলে মানুষ যেমন হাতের কাছে যা পায় তাই আঁকড়াইয়া ধরে, অবিনাশ ও কামিনীও তেমনি প্রভার কথা শুনিয়া উৎসুকদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন আশ্চর্য কি, সকলকে একটু চমক দেওয়ার জন্য ত্রিষ্টুপ হয় তো ফাজলামিই করিতেছে। ত্রিষ্টুপ কথা বলিল না, সে তখন অবাক্ হইয়া খোলা দরজা দিয়া ওদিকের রোয়াকে একটা তুচ্ছ ঘটনা লক্ষ্য করিতেছিল। রোয়াকে একটি আধপোড়া বিড়ি পড়িয়াছিল, কোথা হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়া রমেশ হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিড়িটা কুড়াইয়া নিয়াছে। বিড়ি নিয়া রমেশ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, সেখান হইতে ডাক আসিল রাণুর। ঘরে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাণু ফিরিয়া আসিল।

'দেশলাইটা দাও না দিদিমা, বাবা চাচ্ছে।'

আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া খায়, তিন বছরে রমেশের এমন অবস্থা হইয়াছে? প্রভার জন্য ত্রিষ্টুপ হঠাৎ গভীর মমতা বোধ করে। রমেশকে আজ আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া বেড়াইতে হয় বলিয়াই তো প্রভা সারাদিন নালিশ করিয়া কাঁদিবার অজুহাত খোঁজে। আর কয়েক বছর পরে দু'জনের অবস্থা কি দাঁড়াইবে কে জানে!

অবিনাশ আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না, একবার একটু কাসিয়া বলিলেন, 'তা'হলে চান-টান ক'রে—'

'দাঁড়াও, আসছি।'

ত্রিষ্টুপ একেবারে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল, গলির মোড়ে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি করা উচিত তার একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য সে এখানে পলাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু ভাবিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছে না। দ্বিধা ও সন্দেহে সমস্ত চিন্তা এলো-মেলো হইয়া যাইতেছে। মা ও বাবার জন্য, প্রভা রমেশের জন্য কিছু দিন চাকরী সে করিতে পারে, কিন্তু কেন করিবে? নিজের বিশ্বাস, আদর্শ আর নবলব্ধ প্রেরণা বলি দিয়া লাভ কি হইবে? এক ঘণ্টার মধ্যে প্রথম বাধার কাছেই যদি সে হার মানে, অত বড় প্রতিজ্ঞা করার কি দরকার ছিল? মন যার এমন দুর্বল, তার অত বাহাদুরী করা কেন নিজের কাছে? খানিক আগে যে স্থির করিয়াছে সে চাকরী করিবে না, পৃথিবী রসাতলে গেলেও করিবে না, এত শীগ্‌গির তাকে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া আসিতে হইয়াছে— চাকরী করিবে কি না, আর একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য! সে যে সত্যই অপদার্থ, এর চেয়ে তার বড় প্রমাণ আর কি আছে?

কিছুদিনের জন্য—? নিজের মনেই ত্রিষ্টুপ সংশয়ভরে মাথা নাড়ে। কিছুদিন পরে তো আর অবস্থা বদলাইবে না, বরং সে আরও জড়াইয়া পড়িবে। আজ চাকরী আরম্ভ না করা যত কঠিন মনে হইতেছে,

কিছুদিন পরে চাকরী ছাড়া তার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

তবে আর একটা কথা আছে। চাকরী না করিলেই বা এখন সে কি করিবে? বড় একটা আদর্শ সামনে খাড়া রাখিয়া চুপচাপ ঘরে বসিয়া দিন কাটাইলে তো আর চলিবে না। নিজের জীবনকে সব দিক দিয়া সার্থক করিবার প্রতিজ্ঞা সে গ্রহণ করিয়াছে, মানুষ হিসাবে তার যা প্রাপ্য সব সে আদায় করিয়া ছাড়িবে, জগৎকে বুঝাইয়া দিবে তার কাছে আর ফাঁকি চলিবে না; কিন্তু সে সম্ভব করিবার জন্য সকলের আগে একটা উপায় তো তার খুঁজিয়া বাহির করা চাই? ভাবিয়া চিন্তিয়া উপায় স্থির করার সময় অবশ্য সে পায় নাই, কিন্তু সময় পাওয়ার পরেও যদি সে স্থির করিতে না পারে? যে পথে চলিলে নিচে নামিতে হইবে না, পিছনে হটিতে হইবে না, আগাইতে আগাইতে সার্থকতায় পৌঁছিতে পারিবে, সে পথ যদি খুঁজিয়া না পায়? পথ খুঁজিয়া পাইলেও পথ ধরিয়া চলিবার ক্ষমতা যদি তার না থাকে?

গভীর বিষাদ অনুভব করিতে করিতে নিজেকে তার বড় একা আর অসহায় মনে হয়। আর নিজের মত জগতের প্রত্যেক মানুষকে একা মনে হয় বলিয়া নিজের অখণ্ড ও অবর্জনীয় একাকীত্বের বোঝা যেন দুঃসহ হইয়া উঠে। কত লোক চলিতেছে পথ দিয়া, কত চিন্তার ঢেউ উঠিতেছে প্রত্যেকের মনে, কিন্তু কেউ কারও চিন্তার খবর রাখে না। কত কাছাকাছি সকলের দেহগুলি, তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া একটি দেহের সঙ্গে আর একটি দেহের কতবার ঠোকাঠোকি হইতেছে, কিন্তু একজনের জগৎ কি এতটুকু কাছে আসিতেছে আর একজনের জগতের? এমন একটি মানুষও যদি থাকিত—যে তার আপন, যার সঙ্গে তার প্রকৃত যোগাযোগ আছে, হাসি-কান্না ছাড়াই যে বুঝিতে পারে সে সুখী কি দুঃখী, এখন তাকে সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত তার কি করা উচিত।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে ত্রিষ্টুপের মনে পড়িয়া গেল, সকালে সে চা খায় নাই, রীতিমত অস্বস্তিবোধ হইতেছে ; ডাইনে বিধুর চায়ের দোকান,—'স্বাধীন ভারত রেস্টুরেন্ট'। এক কাপ চা খাইতে খাইতে আর একবার চাকরীর কথাটা ভাবিয়া দেখা যাক। তক্তার মত চ্যাপ্টা বিধুর করাতের মত দাঁতাল অমায়িক হাসির জবাবে একটু হাসিয়া, দেওয়ালে জরিপাড় শাড়ী পরা জগদ্ধাত্রীর ছবির পাশে পাকা ফলের মত টস্‌টসে ও গোলাকার উলঙ্গ জাপানী মেয়ের ছবির দিকে আনমনে চাহিয়া চুমুক দিতে দিতে চায়ের কাপ খালি হইয়া গেল এলোমেলো ভাবনাগুলিকে কোনমতেই আয়ত্ত করা গেল না।

'কলেজ স্কোয়ারে সস্তায় পাওয়া যায়, তিষ্টু।'

মণীশ কাছে আসিয়া বসিয়াছে, আলগোছে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়া আড়চোখে চাহিয়া আছে। জুতা আর চুলে চকচকে পালিশ, পাঞ্জাবির হাতা গিলাকরা, তলায় গেঞ্জি দেখা যায়, সোনার বোতামগুলি সাদা শূন্যতার মধ্যে টুকরো টুকরো সোনালী অলঙ্কারের মত।

'কি পাওয়া যায় ?'

'চীন জাপানের মেয়ে—এদেশীও পাওয়া যায়। কষ্ট করে এখানে না এসে কয়েকটা কিনে এনে ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখিস্, সারাদিন যত খুসী দেখতে পারবি।'

মনে মনে বিরক্ত হইলেও, ত্রিষ্টুপ একটু হাসিল।

'তবে একটা বিয়ে করলে, অবশ্য সব হাঙ্গামা চুকে যায়। তাই কর না ?'

এই ধরনের পরিহাস করিতে মণীশ খুব পটু। বোধ হয় সেই জন্যই মণীশকে সে পছন্দ করে না। মানুষটা মণীশ খারাপ নয় ; সাজসজ্জার দিকে তার অতিরিক্ত ঝোঁকটা ভাল না লাগিলেও, সেটা ত্রিষ্টুপ অপরাধ মনে করে না। মণীশের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ,

পড়াশোনাও সে অনেক করিয়াছে, ত্রিষ্টুপ বুঝিয়া উঠিতে পারে না সব সময়ে সে কেন এমন বাবু সাজিয়া থাকিতে ভালবাসে। ত্রিষ্টুপের সবচেয়ে খারাপ লাগে, মণীশের অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় আর সবজান্তার ভাব। কিছুই সে যেন গ্রাহ্য করে না, সমস্তই তার কাছে যেন তুচ্ছ। রাজপুত্রের বেশে এই নোংরা চায়ের দোকানে চা খাইতে আসিয়া এখানকার সাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে সমানভাবে হাসিগল্প করা আর ছেঁড়া জামা গায়ে চৌরঙ্গীর বড়-সাহেবী হোটেলে খানা খাইতে গিয়া বড় বড় লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যেন তার কাছে সমান। মাঝে মাঝে সে এখানে আসে, বিনা চেষ্টাতে সকলের সঙ্গে মিশ খাইয়া যায়, তবু যেন একটা দূরত্ব ও ব্যবধান কোন সময়েই ঘোচে না। ঠিক অহঙ্কার নয়, মানুষগুলিকে অবজ্ঞা করা নয়, এমন একটা নির্বিকার উদাসীনতার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ করিয়া চলা · প্রতিবেশীর নিন্দায়, গুজবের সৃষ্টিতে, ঘরের ব্যাপারে সঙ্গে মিশাইয়া পৃথিবীর রাজনীতির আলোচনায়, তর্কে আর কলহ-বিবাদে সকলে যখন মস্‌গুল হইয়া যায় মণীশ তাহাতে যোগ দিতে কসুর না করিলেও, ত্রিষ্টুপের মনে হয় সকলের ছেলেমানুষীতে সে ভালে ভালে নিছক আমোদ উপভোগ করিতেছে।

দু’দিন আগে বিকেলবেলা পরিতোষ আসিয়াছিল, শোকে মুহ্যমান পারিতোষ। একটি চেয়ারও খালি ছিল না, সকলের আগে নিজের চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া মণীশ তাহাকে বসিতে দিয়াছিল। কিন্তু তখনও তার মুখে এতটুকু সহানুভূতির চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। মুখ দেখিয়া বরং মনে হইয়াছিল, সে বুঝি ভাবিতেছে অনেক দূরে নৌকাডুবিতে একটি পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে, এখানে একটা মানুষ আধমরা হইয়া যায় কেন!

ভালো লাগে না, কিন্তু মণীশকে তুচ্ছও সে করিতে পারে না। সময়ে সময়ে ত্রিষ্টুপের মনে হয়, আসলে এটা তার ভাল না-লাগা

মোটেই নয়, আর দশজনের মত মানুষের সুখ দুঃখ মানুষটাকে বিচলিত করে না বলিয়া তার অভিমান হইয়াছে, তার প্রতিকারহীন অভিমানের জ্বালাকে মনে হইতেছে বিরাগ।

'মনটা ভাল নেই, মণীশদা।'

'মন ভাল নেই? সে কি কথা! মন খারাপ করেছ কেন?'

'আমি করিনি। ব্যাপারটা শুনুন—'

মণীশ শুনিয়া যায় আর শুনিতে শুনিতে তার মুখ গম্ভীর হওয়ার বদলে যেমন ছিল তেমনি থাকে, হাসি হাসি ভাবটুকু পর্যন্ত মিলাইয়া যায় না। দেখিয়া তিষ্টুপের ভাল-না-লাগা অথবা অভিমান উথলিয়া উঠিতে থাকে।

কথা শেষ করিয়া ঝাঁঝালো সুরে সে তাই জিজ্ঞাসা করিল, 'হাসবার কি হ'ল?'

মণীশ বলিল, 'হাসি নি। চাকরী করতে চাওনা বলছ, বড় কিছু করতে চাও। কি করবে সেটা এখনও ঠিক করো নি। তা যতদিন সেটা ঠিক করতে পারছ না, ততদিন চাকরীটা করলে হত না? কিছু পয়সা জমাতে পারলে বড় কিছু আরম্ভ করতে একটু সুবিধা হবে।'

'কিছুদিন চাকরী করলে যদি—'

'ও ভাবে যদির কথা ভাবলে কিছু হয় না তিষ্টু। প্ল্যান করবার সময়ে সমস্ত যদির হিসাব ধরতে হয়—যদি এরকম হয়, তবে এই ব্যবস্থা করতে হবে, যদি ওরকম হয়, তবে ও রকম ব্যবস্থা করতে হবে; ব্যাস, সেইখানে যদির শেষ। যদি এ রকম না হয়ে ও রকম হয়, ভেবে প্রথমেই ভড়কালে তো চলে না! তা'ছাড়া, কিছুদিন চাকরী করে, সময়মত চাকরীটা ছাড়বার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে, তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে—বড় কিছু করবার ক্ষমতা তোমার নেই। চাকরী করে যাওয়াটাই তখন সব চেয়ে ভাল হবে তোমার পক্ষে।'

'কিন্তু চাকরী করলেই জড়িয়ে পড়ব যে। বাড়ীর লোকের মুখ চেয়ে চাকরী নেওয়ার মানেই দাঁড়াবে—'

'বাড়ীর লোকের মুখ চেয়ে চাকরী নেবে কেন? নিজের জন্য চাকরী নেবে, বড় কিছু করবার অঙ্গ হিসাবে চাকরী নেবে। কি করব, এখনও ঠিক করতে পারিনি, চাকরী করে যা পারি উপার্জন করা যাক—এই ভেবে চাকরী নেবে। বাড়ীর লোকের মুখ চেয়ে বড় কিছু করা যায় না, তিষ্টু। সাক্‌সেসের জন্য স্বার্থপর না হলে চলে না। অবশ্য বাড়ীর লোকের মুখ কেন, পৃথিবীর লোকের মুখ চাইতে কোন বারণ নেই, সকলকে বঞ্চিত করে নিজের সুখ খোঁজার স্বার্থপরতার কথা বলছি না—সাক্‌সেসের পথে বিঘ্ন হিসাবে যা কিছু দাঁড়াবে, সে সমস্ত বিসর্জন দেওয়ার কথা বলছি। যেমন ধর— তুমি যেদিন চাকরীটা ছেড়ে দেবে, বাড়ীর লোক সেদিন কেঁদে-কেটে চোখ ফুলিয়ে ফেলবে, তুমিও তাদের সঙ্গে কাঁদবে, অন্ততঃ মনে মনে কাঁদবে। কিন্তু ভাববে, কাঁদুক, উপায় কি!'

সাড়ে দশটার সময়ে ত্রিষ্টুপ বাড়ী ফিরিল। অবিনাশ রান্নাঘরের দরজার কাছে মোড়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন; তখন পর্য্যন্ত তিনি স্নানও করেন নাই।

'আপিস যাওনি যে?'

'লজ্জা করে না তোর? যোয়ানমদ্দ তুই ঘরে বসে থাকবি, বুড়ো বয়সে আমি খেটে মরব? তুই যদি না যাস, আমিও আর যাব না।'

'চল, চল আমি যাচ্ছি।'—এক খাব্‌লা তেল নিয়ে মাথায় ঘষিতে ঘষিতে ত্রিষ্টুপ তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেল।

বড়বাবু পদ্মলোচন অভিমান করিয়া বলিলেন, 'প্রথম দিনটাতেই দেরী হল!'

অবিনাশ কাচুমাচু করিয়া বলিলেন, 'মন্দিরে একবার পুজো দিতে গিয়ে—'

পদ্মলোচন তাড়াতাড়ি কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, 'তা বেশ, তা বেশ।'

ত্রিষ্টুপ অবাক্ হইয়া দু'জনকে দেখিতে থাকে। একজন অনায়াসে মিথ্যাকথাটা বলিয়া ফেলিল ; পুজো দিতে গিয়া আপিস পৌঁছিতে দেরী করার জন্য বিরক্ত হইলে পাছে অপরাধ হয়, এই ভয়ে আর একজনের বিরক্তি সঙ্গে সঙ্গে উপিয়া গেল। দু'জন সমবয়সী নিরীহ গোবেচারী মানুষ, জীবনটাও হয়তো দু'জনের একই ছাঁচে ঢালা—পরীক্ষা পাস, চাকরী ও সংসার—কিন্তু একজন মন্দিরের নামে মিথ্যা বলিতে ভয় পায় না, আর একজন মন্দিরের নাম শুনিলেই ভড়কাইয়া যায়।

আপিস ত্রিষ্টুপের অপরিচিত নয়, আগে মাঝে মাঝে দরকার পড়িলে বাপের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে ; চাকরী হওয়ার সময়ে বিনা দরকারেই ঘনঘন অনেক বার আসিয়াছে। অনেকের সঙ্গেই তার চেনা ছিল, অবিনাশ আরও কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন—প্রত্যেকের ভদ্রতা ও শুভ কামনার জবাবে সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, 'আপনার দয়া।'

বাড়ী ফিরিবার সময়ে ট্রামে ও ট্রেনে অবিনাশ ছেলেকে অনেক রকম উপদেশ দিলেন, আপিসে কোন্ লোকটা ভাল আর কোন্ লোকটা বজ্জাত মুখে মুখেই তার লম্বা তালিকা শুনাইয়া দিলেন ; কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিতে হইবে তাও বুঝাইয়া দিলেন।

'—আস্তে আস্তে ডিপ্লোমেসী শিখতে হবে, নইলে উন্নতির কোন আশা নেই বাপু! দেরী করার জন্য পদ্মলোচন চটে ছিল, দেখলি তো কেমন সামলে নিলাম?'—অবিনাশ সগর্বে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন—'অন্য কেউ হলে কেঁউ কেঁউ করত, ব্যাটা আরও চটে যেত, আমি তো জানি কত ধানে কত চাল, এমন কৈফিয়ৎ দিলাম যে আর টুঁ-শব্দটি করতে পারল না!—একটু থামিয়া

উপসংহার করিলেন, তবে লোকটা সত্যি ধার্মিক। মন্দির দেখলেই আধঘণ্টা ধরে প্রণাম করে।'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'আর প্রার্থনা করে, আমার মাইনে বাড়ুক?

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সে তো সবাই করে!'

বিধুর চায়ের দোকানে মণীশ বসিয়াছিল। সূর্য চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এত আগে মণীশ কখনও বিধুর চায়ের দোকানে আসে না।

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'তুমি এগোও বাবা, আমি আসছি।'

চায়ের দোকানে ঢুকিতে যাইতেছে দেখিয়া অবিনাশ শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, 'খালি পেটে চা খেও না তিষ্টু।'

ত্রিষ্টুপ মাথা নাড়িয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মণীশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগল তিষ্টু?'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'কেমন যেন লাগল, মনিদা।'

'কেমন লাগল বুঝতে পারছ না? তার মানে ভালও লাগেনি, খারাপও লাগেনি।'

'সব যেন কেমন খাপছাড়া মনে হল।'

মণীশ মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, 'বোস, চা খাও।'

ত্রিষ্টুপ দ্বিধাভরে বলিল, 'খালি পেটে—'

মণীশ হাসিল, 'পেট খালি থাকবে কেন? চপ খাও কাটলেট খাও, টোস্ট খাও,—বাড়ীর খাবার না হলে কি তোমার পেট ভরে না?'

মণীশের কাছে চিরদিন নিজেকে ত্রিষ্টুপের ছেলেমানুষ মনে হয়, আজ আরও বেশী মনে হইতে লাগিল। একটু শ্রান্তিও সে বোধ করিতেছিল, শারীরিক নয়, মানসিক শ্রান্তি।

সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তবু সকালবেলায় লড়াই-এর জের যেন এখনও মেটে নাই, কেবলি মনে হইতেছে, সে যেন সন্ধি করিয়াছে হার মানার ভয়ে। কেমন একটা অনির্দিষ্ট ভাবে নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছে।

'থাক্, দোকানের খাবার খেতে হবে না তিষ্টু। আমার বাড়ীতে কিছু খাবে চল।'

'আপনার বাড়ীতে মণীশদা? খাবার-টাবার করার হাঙ্গামা—

'হাঙ্গামা আর কিসের? খাবার তৈরী হয়েই আছে, চা'টা শুধু করতে হবে।'

মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইল।—'এস।'

মণীশের বাড়ী বেশী দূরে নয়, দু'চার বার ত্রিষ্টুপ তার বাড়ীতে গিয়াছে। আগে কোনদিন মণীশ তাকে ভিতরে ডাকে নাই, আজ একেবারে দোতলায় তার নিজের ঘরে নিয়া গেল।

'বস তিষ্টু।'

একটা রঙ্‌চটা কাঠের চেয়ারে বসিয়া ত্রিষ্টুপ বিস্ময়ের সঙ্গে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। এ ঘর যে মণীশের, তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। যার মাথায় একটি চুল সে কোনদিন স্থানভ্রষ্ট দেখে নাই, তার ঘরে এমন বিশৃঙ্খলা এমন দারিদ্র্যের ছাপ।

টেবিলে আর টেবিলের নিচে বই গাদা করা, এক কোণায় জমা করা কতকগুলি ইংরাজী বাংলা সাময়িক পত্রে ধূলা জমিয়া আছে, ট্রাঙ্কও স্যুটকেশটির রঙ বিবণ, অনেক দিনের পুরানো খাটের বিছানার চাদরটা ময়লা। নূতন সোফা-টেবিলে জমকালো বাহিরের ঘর পার হইয়া বাড়ীর ভিতরের গরীবানা অপরিছন্ন চেহারা দেখিয়াই ত্রিষ্টুপ একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল, মণীশের নিজের ঘর দেখিয়া সে একেবারে থ বনিয়া গেল।

তাকে বসিতে বলিয়াই মণীশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। একটু পরেই সে ফিরিয়া আসিল। আরও খানিক্ষণ পরে দু'হাতে দুটি থালায় লুচি আর তরকারি নিয়া একটি মেয়ে ঘরে আসিল।

মেয়েটিকে ত্রিষ্টুপ কলতলায় বাসন মাজিতে দেখিয়াছিল।

॥ দুই ॥

মণীশের বোনের নাম কুন্তলা। বিবাহ-দেওয়া-দরকারের বয়স হইয়াছে—দু-এক বছর বেশীই হইয়াছে। এই বয়সে সময় হিসাবে দু-এক বছর যে কত দীর্ঘ আর অ-তুচ্ছ কে তা না জানে? দাদা যে ত্রিষ্টুপকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়াছে কেন সেটুকু বুঝিবার মত আর বুঝিয়া যে জোরালো লজ্জা সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিয়া দিতে চায়, সেটা জোর করিয়া লুকাইয়া রাখার চেষ্টা করার মত জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কুন্তলার জন্মিয়াছে।

প্রথমটা তাই ত্রিষ্টুপের মনে হইয়াছিল, মেয়েটা বুঝি একটু পাকা। তারপর দু-চার দিনেই এ ভুলধারণা তার ঘুচিয়া গিয়াছে। কুন্তলার চাল-চলন কথাবার্তায় যেটুকু অস্বাভাবিকতা ধরা পড়িয়াছিল, এখনও কিছু কিছু ধরা পড়ে, সাধারণ গৃহস্থ সংসারের এই বয়সের দেয়াল-চাপা ভীরু মেয়ের পক্ষে ওটুকু অস্বাভাবিকতাই স্বাভাবিক। তৃতীয়বার কুন্তলা যখন খাবারের থালা হাতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন ত্রিষ্টুপের খেয়াল হইয়াছিল যে বেচারী জানে, তাকে পছন্দ করাইতে পারিলে সে তাকে বিবাহ করিলেও করিতে পারে! পঞ্চম বার মণীশের বাড়ীতে গেলে কুন্তলা যখন চলনসই কাঁপা গলায় রবিবাবুর একটি গান শুনাইয়াছিল তখন ত্রিষ্টুপের আরেকটা বিষয় খেয়াল হইয়াছিল; তার মন ভুলানোর চেষ্টার মত কিছু পাছে বলিয়া বা করিয়া বসে এই ভয়ে কুন্তলা বড়ই কাবু হইয়া আছে।

ত্রিষ্টুপ মমতা বোধ করে। ভাবে যে মণীশের বাড়ীতে আর আসিবে না। এভাবে মেয়েটাকে পীড়ন করা, তার মনে

মিথ্যা আশা জাগিবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। কেবল কুন্তলা নয়, মণীশও তো অনেক কিছু আশা করিতেছে। তাকেও এ আশা পোষণ করিয়া চলিতে দেওয়া অন্যায় হইবে বৈকি।

আগে হইতে যদি মণীশের বাড়ীতে তার যাতায়াত থাকিত, তবে কোন কথা ছিল না। চাকরী হওয়ার পর তার কাছে বোনকে গছানোর ইচ্ছা মণীশের জাগিয়াছে টের পাইয়াও ওদের বাড়ী যাওয়া আসা বজায় রাখা দোষের হইত না। কিন্তু চাকরী আরম্ভ করার দিন তাকে বাড়ীতে ডাকিয়া নিয়া গিয়া কুন্তলার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়ার মধ্যে মণীশ তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট রাখে নাই। জানিয়া শুনিয়া এখন ঘন ঘন মণীশের বাড়ী যাওয়া চলে না।

কিন্তু দু'দিন যাওয়া বন্ধ রাখিয়াই ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল, কাজটা সহজ নয়। সন্ধ্যার পর মণীশের ছোট ভাই ক্ষিতীশ আসিল। কুন্তলা নয়, মণীশের মা নিজে পিঠা তৈরী করিয়াছেন, এখনও ত্রিষ্টুপ যায় নাই কেন? অবিলম্বে ক্ষিতীশের সঙ্গেই সে যেন গিয়া হাজির হয়।

'ছোড়দি হাঁ করে বসে আছে, চলুন শীগগির।'

ত্রিষ্টুপের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল।

—'ক্ষিতু, তোমাকে কে বলল ছোড়দি হাঁ করে বসে আছে?'

ক্ষিতীশ একটু ভড়কাইয়া গেল, বড় বড় চোখ মিলিয়া ত্রিষ্টুপের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'আমি দেখে এলাম যে?'

'ও তুমি দেখে আসছ। দাদা বলতে বলে নি, না?'

ক্ষিতীশ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'দাদা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।'

'কেন?'

ক্ষিতীশের মুখে এবার একটু হাসি দেখা দিল। বড়রা কি বোকার মত কথা বলে!

'পিঠে খাবার জন্য।' ছোড়দি কি বলে জানেন? আপনি শুধু-

পিঠে খেতে পারেন, আর আমি পারি। দু'টো তিনটের বেশী খেলেই দাদার অসুখ করে।”

এতক্ষণে ত্রিষ্টুপের গাম্ভীর্য কাটিয়া গেল। মনে মনে সে রীতিমত লজ্জাই বোধ করিতে লাগিল। পছন্দ হইলে কুন্তলাকে সে বিবাহ করিতে পারে ভাবিয়া বোনের সঙ্গে তার মেলামেশার ব্যবস্থা করিয়া দিলেও তাকে গাঁথিবার জন্য চালবাজী আরম্ভ করিয়া ব্যাপারটাকে কুৎসিৎ করিয়া তুলিবার মানুষ মণীশ নয়। তার নিজের মনটাই বিগড়াইয়া গিয়াছে।

তাকে পিঠা খাওয়ানোর জন্য কুন্তলা তার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে ; হয়তো পরণের ছেঁড়া ময়লা শাড়িখানি বদলাইয়া একখানি ফর্সা শাড়ী পরিয়াছে—সস্তা সাধারণ শাড়ী, পাছে সে মনে করে যে তার জন্যই সাজগোজ। একবার ত্রিষ্টুপের মনে হইল, পিঠা খাওয়ার নিমন্ত্রণটা রাখিয়া আসে। একেবারে যাওয়া বন্ধ না করিয়া ধীরে ধীরে যাওয়াটা কমাইয়া আনাই কি ভাল নয় ? দু'দিন যায় নাই, আজ যখন ক্ষিতীশ ডাকিতে আসিয়াছে, আজ একবার গেলে কি আসিয়া যাইবে ? আবার চার পাঁচ দিন একবারে না গেলেই চলিবে। তারপর ত্রিষ্টুপ ভাবিল, না, আজ না যাওয়াই ভাল। যাওয়ার ইচ্ছাটা তার নিজেরই আজ বড় বেশী জোরালো হইয়া উঠিয়াছে, যাওয়ামাত্র সকলে তার আগ্রহ টের পাইয়া যাইবে। কাল পরশু বরং দশ মিনিটের জন্য গিয়া দেখা করিয়া আসিবে, কতকটা ভদ্রতা রক্ষার জন্য দেখা করার মত। আজ নয়।

‘আমার শরীর তো আজ ভালো নেই ক্ষিতু, কি করে যাব ?

‘অসুখ করেছে ?’

‘হ্যাঁ, অসুখ করেছে।’

ক্ষিতীশ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলে ত্রিষ্টুপ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। মিথ্যা অজুহাতে ক্ষিতীশকে ফিরাইয়া দিবার জন্য নয়, যায় নাই বলিয়া কুন্তলা ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়াও নয়, মণীশের

বাড়ীর আকর্ষণ অনুভব করিয়া। এত অল্প সময়ের মধ্যেই কুন্তলা যদি তার মনকে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকে, নিজের সম্বন্ধে তবে আর আশা ভরসা করিবার কিছু নাই।

আধ ঘণ্টা পরে মণীশ আসিল।

'কি হয়েছে তিষ্টু?'

'এমনি শরীরটা একটু—'

'বিশেষ কিছু নয় তো? তবে এসো—দু'টো একটা পিঠে তোমায় খেতেই হবে ভাই। কাল থেকে আয়োজন করে পিঠে তৈরী হয়েছে, তুমি চেখে দেখে সার্টিফিকেট না দিলে কেউ খুসী হবে না।'

সুতরাং ত্রিষ্টুপ গেল। আগের দিন সহরের অন্য প্রান্ত হইতে স্বামী ও দুটি মেয়েকে নিয়া কুন্তলার দিদি বাপের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। পিঠার আয়োজনটা হইয়াছে ওদের জন্যই, ত্রিষ্টুপের জন্য নয়।

কুন্তলার দিদি রমলাকে দেখিয়া ত্রিষ্টুপ আশ্চর্য হইয়া গেল। কুন্তলার চেয়ে সে বয়সে চার পাঁচ বছরের বড়, সাত বছর আগে তার বিবাহ হইয়াছে এবং মেয়ে হইয়াছে দু'টি; তবু প্রথমবার তার দিকে তাকাইয়া ত্রিষ্টুপের মনে হইয়াছিল, কুন্তলাই বুঝি শাড়ী গয়না পরিয়া সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া বৌ সাজিয়াছে। যমজ না হইয়াও যে দুটি বোনের চেহারায় এত মিল থাকিতে পারে, ত্রিষ্টুপ কোন [illegible] কল্পনাও করিতে পারে নাই।

কেবল বাহিরের নয়, দুজনের ভিতরের মিলটাও যে বিস্ময়কর, প্রথমে ত্রিষ্টুপের কাছে তা ধরা পড়ে নাই। কুন্তলা ভীরু লাজুক নম্র; রমলা হাসিখুসী, মিশুক, কথা বলিতে পটু। সাত বছ[illegible] বিবাহিত জীবন অধিকাংশ মেয়েকেই ভোঁতা করিয়া দেয়, রমলার বেলা ফলটা হইয়াছে যেন ঠিক তার উল্‌টা। তার অনুভূতি তীক্ষ্ণ হইয়াছে, জীবনীশক্তি বাড়িয়াছে, আনন্দ আহর[illegible] ক্ষমতা বাড়িয়াছে। স্ফূর্তি আর উৎসাহের জন্য যেন বিশেষ উ[illegible]কার হয় না;

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে উৎসবের প্রেরণা যেন সঞ্চিত আছে, চয়ন করিয়া নিলেই হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে দুজনের এতখানি পার্থক্য সত্ত্বেও মিলটা ত্রিষ্টুপের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল, কুন্তলার সঙ্গে রমলার শুধু বিকাশের পার্থক্য—কিশোরীর সঙ্গে যুবতীর। যে কথায় কুন্তলার মুখে মৃদু হাসি ফুটিতেছে, সেই কথাতেই রমলা হাসিয়া উঠিতেছে উচ্ছ্বসিত ভাবে, যে মমতায় কুন্তলা কচি মেয়েটাকে কোলে নিয়া সন্তর্পণে তার গালে চুমা দিয়া বলিতেছে, কেঁদো না, সেই মমতাতেই রমলা বড় মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া দলিয়া মলিয়া তাকে বুকের সঙ্গে যেন মিশাইয়া দিতে চাহিয়া বলিতেছে, 'কাঁদে না যাদু, মামা বাড়ী এসে কি কাঁদতে আছে রে দুষ্টু পাজী সোনা ?'

যে সুখ দুঃখের হিসাব কুন্তলা ভবিষ্যতের কল্পনায় জমা রাখিয়া ভাবিতেছে, কে জানে আমার কপালে কি আছে, সেই সুখ-দুঃখের স্বাদ নিতে নিতে রমলা ভাবিতেছে কে জানে আমার কপালে এত সুখ টিকিবে কি না! রমলা সত্য সত্যই সুখী। কেবল নিজে সে সুখী হয় নাই, আরেক জনকেও সুখী করিয়াছে। রমলার স্বামী ধীরেনের শান্ত, পরিতৃপ্ত আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ত্রিষ্টুপের হঠাৎ এক সময় মনে হয় জীবনের হিসাব নিকাশের অঙ্কশাস্ত্রটাই কি তবে তার ভুল? তিরাশী টাকার একজন কেরাণী এমন সুখী হইল কি করিয়া ?

॥ তিন ॥

ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে—এটা সে পছন্দ করিতে পারিতেছে না। মানুষকে দেখিয়া কোথায় সে নিজেও সুখী হইবে, তার বদলে মন তার বিরূপ হইয়া পড়িতেছে—তিরাশী টাকার কেরাণীর জীবনে সুখ-শান্তির অস্তিত্ব মানিতে সে রাজী নয়। দেখিয়া যা মনে হইতেছে তা সত্য নয়, আসলে এদের দুজনের জীবন দুঃখময়—এ ধারণা সে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়।

কদিন এদের কথাই সে ভাবিয়া যায়। চিন্তাধারার প্রতিবাদের মত, অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রমের মত দুজনে তাকে পীড়ন করিতে থাকে। চারিদিকে সে দেখিতে পায় মানুষের মুখে দুঃখের কালো ছায়া, দেহে ক্ষয়, জীবনে অপচয়, সঙ্কীর্ণ, নিঃস্ব আবেষ্টনীর পেষণ। এই পরিচয়েরই ছাপমারা তার বর্তমান। তাই তো সে ভবিষ্যৎ রচনা করিতে চায়। আজ কিছু নাই, কাল ঐশ্বর্য চাই। এই অবস্থায় ধীরেন ও রমলা আবার কি ধাঁধা সৃষ্টি করিল!

মণীশকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'ধীরেনবাবু বেশ লোক না?'

'হ্যাঁ ও ভালো মানুষ, খাঁটি।'

মণীশের কথার মানে তার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল কয়েক দিন পরে। নিজেদের সংসারে ধীরেন ও রমলাকে দেখিয়া আসিবার ইচ্ছাটা সে দমন করিতে পারিতেছিল না। রবিবার বিকালে সে সহরের এক প্রান্তে তাদের ছোট একতলা বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল।

আগের দিন প্রথম রাত্রে অসময়ের ঝড় উঠিয়াছিল। ঝড় উঠিলে, ত্রিষ্টুপ গভীর উল্লাস বোধ করে। ঝড়ের বেগে বাড়ীর কাছে সিধা

তরুণ আমলা গাছটি যত বাঁকা হইয়া যায়, তার বাঁকা মন যেন অনির্বচনীয় পুলকে ততই খাড়া হইয়া ওঠে। এই সতেজ গর্বিত আনন্দে সাপের মত মনের কোন অন্ধকার কোণে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে, সাপুড়িয়ার বাঁশীর মত ঝড়ের সাঁ-সাঁ আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়া ফণা উঁচু করে। ঝড় থামিয়া যাওয়ার পরেও এই উত্তেজনার প্রভাব মিলাইয়া যাইতে কয়েকদিন সময় লাগে, ত্রিষ্টুপের অনুভূতি রসে ভিজিয়া সজীব হইয়া থাকে।

ধীরেনের বাড়ীর অবস্থানটি ত্রিষ্টুপের ভারি ভাল লাগিল। এ সহরতলী পুরানো, সহরের পরিসর বাড়ানোর প্রয়োজনে নূতন সৃষ্টি হয় নাই। পুরানো বাড়ীগুলি এলোমেলো ভাবে বসানো, রাস্তা আঁকাবাঁকা। আগাছাভরা বাগানের কয়েকটি টুক্‌রা এখানে ওখানে বসানো আছে। ধীরেনের বাড়ীর অদূরে পানার আস্তরণ বিছানো একটি পুকুর। কাছে ও দূরে অনেক নারিকেল গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তায় ছোট ছেলেদের মার্বেল খেলায়, বাড়ীর সামনে রোয়াকে বসিয়া বড় ছেলেদের জটলা করায়, উবু হইয়া বসিয়া এক প্রৌঢ়ের হুঁকা হাতে তামাক খাওয়ায়, ছেলে কোলে এক বাড়ীর দুয়ার হইতে বাহির হইয়া একটি আধ ময়লা শাড়ী পরা তরুণীর আরেক বাড়ীর দুয়ারে ঢুকিয়া পড়ায়, তার এখনকার শান্ত মানসিক অবস্থার সঙ্গে কেমন একটা আশ্চর্য সামঞ্জস্য সৃষ্টি হইতেছে।

বাড়ীর ভিতরে গৃহসজ্জার মধ্যেও একটি সর্বাঙ্গীন সঙ্গতি তার বড়ই তৃপ্তিকর মনে হইল। এ সব সংসারে বিশৃঙ্খলার চেয়ে বেশী চোখে পড়ে অসঙ্গতি। ভাঙ্গা চৌকীর পাশে মস্ত দামী ড্রেসিং টেবিল, পেরেক মারা কাঠের চেয়ারের পিঠে রঙীন সুতার কাজ করা খোল, দামী ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রের পাশে আঠা দিয়া দেয়ালে আঁটা মাসিকের ছবি, ময়লা বিছানার চাদরে ধবধবে পরিষ্কার ওয়ার-পরানো তেল-চটচটে বালিশ, পিঁড়ির সঙ্গে কার্পেটের আসন, সযত্নে সাজানো জিনিষের একটি তাকের নিচেই অযত্নে ছড়ানো জিনিষের

আরেকটি তাক। এ বাড়ীর গৃহোপকরণে সেই বিসদৃশ বিরোধ নাই, চারিদিক ছড়ানো একটি বিস্ময়কর সাম্যের ভাব দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়।

ত্রিষ্টুপের মনে হয়, এ ঘর যারা সাজাইয়াছে তাদের সত্যই বুদ্ধি আছে। অতিরিক্ত ঝকঝকে কিছু তারা চায় নাই বলিয়া একেবারে রঙচটা কিছু তাদের রাখিতে হয় নাই। তিনটি ভাঙ্গা চেয়ারের মধ্যে একটি খুব দামী চেয়ারে তাকে বসানোর গৌরব বাতিল করিয়া দিয়াছে বলিয়া চারটি সাধারণ শক্ত চেয়ারের যে কোন একটিতে তাকে নিশ্চিন্ত মনে বসিতে বলিতে পারিয়াছে।

ধীরেন ও রমলা যে রকম আগ্রহের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানাইল, ত্রিষ্টুপের বিশ্বাস করাই কঠিন হইয়া পড়িল যে, তার সবটাই আন্তরিক। তার সঙ্গে এদের পরিচয় শুধু একদিনের। রমলা একবার শুধু তাকে বলিয়াছিল, সে এ বাড়ীতে আসিলে তারা খুসী হইবে। ভদ্রতা করিয়া ও কথা কে না বলে? ওই আহ্বানেই কেউ বাড়ীতে আসিলে, ভদ্রতা করিয়া কে না খুসী হয়? কিন্তু সে আসায় সত্য এদের যেন আনন্দের সীমা নাই। তার এই অনুগ্রহে তারা যেন কৃতার্থ হইয়াছে।

রমলা বলিল, 'আপনি এক দিন আসবেন জানতাম।'

'কি করে জানতেন?'

'অনেকে বলে যায়, কিন্তু আসে না। দু'চার মাস পরে দেখা হলে বলে, সময় পাইনি, বড্ড ব্যস্ত ছিলাম, এবার একদিন নিশ্চয় যাব। আপনি তাদের মত নন। সেদিন কথা বলেই বুঝতে পেয়েছিলাম।'

ছোট মেয়েটিকে কোলে করিয়া রমলা বসিয়াছে, বড় মেয়েটি চেয়ার ঘেঁসিয়া মার পিঠে এক হাত রাখিয়া শান্ত কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। রমলার ভাব দেখিলে সত্যই মনে হয়, ত্রিষ্টুপ আজ ঠিক এইসময়ে আসিবে জানিয়া নিশ্চিন্ত মনে তার সঙ্গে কথা বলার

জন্য আগে হইতেই সব কাজ, সব হাঙ্গামা চুকাইয়া রাখিয়াছে। অন্য সমস্ত বিষয়ের চিন্তাও সে এখনকার মত মনের একপাশে সরাইয়া দিয়াছে, তার সবটুকু মনোযোগ এখন অভ্যাগতের প্রাপ্য। সংসারের কোন কাজ, কোন দায়িত্ব যাদের নাই, বাড়ীতে কেউ আসিলে তাদেরও ত্রিষ্টুপ এমন স্থির শান্ত একাগ্রভাবে কখনও এক মিনিট আলাপ করিতে দেখে নাই, প্রতি মুহূর্তে রমলা যেন তার আত্মমর্যাদা বাড়াইয়া দিতে থাকে। একজনের প্রথম বাড়ীতে আসার অপরিহার্য অস্বস্তি ও সঙ্কোচ আপনা হইতে যেন কোথায় মিলাইয়া যায়।

আজ ত্রিষ্টুপ প্রথম বুঝিতে পারে—অন্যে তুচ্ছ করিলে নিজের কাছে মানুষ কি ভাবে তুচ্ছ হইয়া যায়, অন্যে দাম দিলে কিভাবে দাম বাড়ে।. জীবনকে রমলা শ্রদ্ধা করে। ধনীকে নয়, মানীকে নয়, গুণীকে নয়, জীবনের প্রতীক মানুষকে সে সম্মানের অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে। তার কাছে থাকিলে ব্যর্থতার ক্ষোভ মানুষের তুচ্ছ হইয়া যায়। কারণ, কিছু না বলিয়াও সে যেন ক্রমাগত বলিতে থাকে, ব্যর্থতা ও সার্থকতার চেয়ে মানুষ অনেক বড়, যে অবস্থায় জীবন যাপন করুক, মানুষ চিরদিনই মানুষ।

রাত প্রায় আটটার সময়ে ত্রিষ্টুপ বিদায় নিল। পথে এবং বাড়ী ফিরিয়া রাত্রে ঘুম আসা পর্য্যন্ত এই নূতন অভিজ্ঞতাই সে মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তিরাশীটাকার এক কেরাণীর জীবন রমলা সুখে ও শান্তিতে ভরিয়া দিয়াছে। অপূর্ণতা তাকে পীড়ন করে না, রমলা তার আত্মগ্লানি জাগিতে দেয় না। দুঃখের ছোঁয়াচ লাগিলে রমলা তাতে নিজের আনন্দে প্রলেপ লাগাইয়া দেয়। এক বিষয়ে হতাশা জাগিলে অনেক বিষয়ে আশা জাগাইয়া রমলা তাকে সঞ্জীবিত করে। যা আছে, তারই সন্তোষে মন ভরিয়া রাখিয়া, বাঁচিবার প্রয়োজনে মাসে মাসে তিরাশী টাকা দানের জন্য দেবতার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিয়া দারিদ্র্যের পেষণ ভুলাইয়া রাখে।

মণীশ বলিয়াছিল, ধীরেন ভালমানুষ খাঁটি। তাকে কাঁদাইলে

সে কাঁদে, হাসাইলে সে হাসে। তাই কি রমলা তার মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখিতে পারিয়াছে? অন্য কোন মানুষ হইলে পারিত না?

এই একটা খট্‌কা ত্রিষ্টুপের মনে জাগিয়া থাকে। রমলাই যে ধীরেনকে সুখী করিয়াছে তাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেটা যে ধীরেনের ব্যক্তিত্বের অভাবের জন্য সম্ভব হইয়াছে তাও সে বিশ্বাস করিতে পারে না। ধীরেনের পরিচয়ও সে আজ ভাল করিয়া জানিয়া আসিয়াছে। দুর্বল পরনির্ভরশীল হাবাগোবা মানুষ সে নয়। ত্রিষ্টুপের তাই মনে হয় শুধু ধীরেন নয়, যে কোন মানুষকে রমলা সুখী করিতে পারিত; বিকারগ্রস্ত অস্বাভাবিক মানুষ ছাড়া।

তাকেও পারিত।

বিছানায় শুইয়া এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আধা ঘুম আধাজাগরণের মধ্যে ত্রিষ্টুপের চিন্তা ও কল্পনা জড়াইয়া যাইতে থাকে। সে যেন দেখিতে পায়—তাকে সুখী করার জন্য কুন্তলা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। যে রকম একটি ছোট একতলা বাড়ীতে রমলা আর ধীরেন বাস করে, অবিকল সেই রকম একটি বাড়ীতে ঠিক রমলার মত সাজ করিয়া কুন্তলা কাঠের চেয়ারে বসিয়া আছে, তার কোলে একটি শিশু, তার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে আরেকটি মেয়ে।

মণীশের বাড়ী যাওয়া সে বন্ধ করিয়া দিল। ধীরেনের বাড়ীতেও আর গেল না। রমলাকে দেখিলে মনে পড়িবে কুন্তলাও তারই মত। ধীরেনের পরিতৃপ্ত মুখ দেখিতে হইবে, মনে হইবে কুন্তলাকে নিয়া এমনি সুখের সংসারে পাতিতে কোন বাধা নাই। সে সুখশান্তি চায় না। ধীরেনের মত আনন্দোজ্জ্বল হাসির বিনিময়েও সঙ্কীর্ণ খাঁচায় সে ঢুকিবে না। আর বিচার বিবেচনা নয়, বসিয়া বসিয়া লাভ লোকসানের হিসাব নিয়া মাথা ঘামানো নয়। যা' সে ঠিক করিয়াছে তাই ঠিক। জগৎ চুলোয় যাক।

মণীশ খোঁজ করিতে বাড়ী আসিল না, ক্ষিতীশও আসিল না।

দিন সাতেক পরে ত্রিষ্টুপ আপিস হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, সেই চায়ের দোকান হইতে মণীশ তাকে ডাকিল।

দোকানে এখন ভিড় জমিয়াছে, একটি চেয়ারও খালি ছিল না। দোকানের ছোকরা কোথা হইতে একটা ভাঁজ করা চেয়ার আনিয়া ছোট একটু ফাঁকের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

'একজন আজ একশ টাকা ঠকিয়েছে, তিষ্টু।'

'কে?

'তুমি চিনবে না। পাল চৌধুরী কোম্পানীর পালবাবু।'

'চিনি। একবার চাকরীর খোঁজে দেখা করেছিলাম।'

'ওর একশ লাখ টাকা আছে। আমার একশটা টাকা কি করে আদায় করা যায় বসে বসে ভাবছিলাম।'

ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়া ত্রিষ্টুপ বলিল, 'ও টাকার আশা ছেড়ে দিন। ভেবে আর কি করবেন?'

মণীশ মৃদু হাসিল।—'ভেবে আর কি করব, টাকা আদায় করব।'

টাকার জন্য মণীশকে একটু বিচলিত মনে হয় না। পালবাবু টাকাটা না দেওয়ায় সে যেন খুসী হইয়াছে—আদায়ের জন্য লড়াই করিতে পারিবে। মণীশের প্রকৃতির এই দুর্বল দিকটা ত্রিষ্টুপ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পাওনা আদায়ের জন্য লড়াই করিতে সে যদি ভালবাসে, সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য একজনের সঙ্গে শুধু লড়াই না করিয়া অনেক টাকার জন্য অনেকের সঙ্গে লড়াই করে না কেন? সে কি মনে করে সে যা পায়, তার বেশী আর কিছু তার পাওনা নাই? উপার্জন বাড়ানোর জন্য সে তার অসাধারণ শক্তিগুলি কাজে লাগাইতে অবহেলা করে; কিন্তু কেউ একটী পয়সা ফাঁকি দিলে নির্মম ধৈর্যের সঙ্গে সেই পয়সাটী ছিনাইয়া আনিবার জন্য প্রায় সাধনা সুরু করিয়া দেয়।

'কদিন যাওনি কেন, তিষ্টু?'

'খুব ব্যস্ত ছিলাম।'

মণীশ আর কিছুই বলিল না। তার আগ্রহের অভাবে ত্রিষ্টুপও একটু আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে রাস্তায় নামিয়া হঠাৎ সে বলিল, 'কুন্তলার যদি বিয়ে দেন—'

ত্রিষ্টুপের দুই কান গরম হইয়া উঠিল। কথায় কথায় মণীশের কাছে কুন্তলার বিবাহ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, বিনা ভূমিকায় এমন ভাবে কথা তুলিবার কোন ইচ্ছা তার ছিল না। মণীশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

'কুন্তলার বিয়ে দেবেন না ?

'দেবো বৈকি। বিয়ে না দিলে চলবে কেন ?'

'আমাদের অফিসে একটী ছেলে আছে তার সঙ্গে চেষ্টা করতে পারেন। নরেশ নাম। ছেলেটি বেশ ভাল ; বাড়ীর অবস্থাও মন্দ নয়। আপনি যদি বলেন—'

মণীশ হাসিমুখে তার একটি হাত ধরিয়া বলিল, 'কুন্তলার বিয়ের জন্য ভেবো না, ভাই। যার তার হাতে ওকে দিতে পারব না। আমি ছাড়া ওর জন্য কেউ ছেলে খুঁজে বার করতে পারবে না।'

'এ ছেলেটি—'

'খুব ভাল ছেলে। কিন্তু কুন্তলার সঙ্গে ওর যে বনবে তার ঠিক কি ? আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারনি, তিষ্টু। বাংলা দেশের সব চেয়ে ভাল পাত্রটির সঙ্গেও আমি কুন্তলার বিয়ে দেব না। এমন একটী ছেলে খুঁজে আনব, যার সঙ্গে বিয়ে হলে কুন্তলা সুখী হবে। ছেলের অবস্থা কেমন, স্বাস্থ্য কেমন, চরিত্র কেমন, এ সব দেখার আগে আমি দেখব ছেলের প্রকৃতি কেমন, কুন্তলার সঙ্গে খাপ খাবে কিনা ?'

ত্রিষ্টুপ সায় দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ সেটা দেখা দরকার বটে।'

তাড়াতাড়ি কুন্তলার বিবাহ মিটাইয়া দিয়া নিজেকে বাঁচানোর জন্যই সে ভাল একটি ছেলের সন্ধান দিয়াছে, অথচ একটু বিবেচনা

পর্যন্ত না করিয়া মণীশ প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া তাকে যেন বাঁচাইয়া দিল। মণীশের কথা শুনিতে শুনিতে যতই তার মনে হইতে লাগিল কুন্তলার উপযুক্ত ছেলে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়, ততই যেন মনটা তার হাল্কা হইয়া যাইতে লাগিল।

মণীশ বলিল, 'সব চেয়ে বেশী দরকার। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি। তোমাদের হিসাবে ধীরেনের চেয়ে হাজার গুণ ভাল একটি ছেলে রমলার জন্য পাওয়া গিয়েছিল—এখন সে মাসে হাজার টাকা রোজগার করে। আমিই জোর করে ধীরেনের সঙ্গে রমলার বিয়ে দিয়েছিলাম। ভালই করেছিলাম কি বল?'

'আচ্ছা মনি দা, বিয়ের আগে ওদের পরিচয় ছিল?'

মণীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, ,না।'

॥ চার ॥

ঠিক এই অবস্থাতেই ত্রিষ্টুপের দিন কাটিতে লাগিল। জীবনটা মনে হইতে লাগিল একঘেয়ে।

কয়েকটা মাস কাটিয়া গেল, কোন দিক দিয়া অবস্থার অপ্রত্যাশিত কোন পরিবর্তন ঘটিল না; জিভে খারাপ লিভারের স্বাদের মত ত্রিষ্টুপের মনে জাগিয়া রহিল ভয়ার্ত ব্যাকুলতার বদ গ্লানি। নিজের আলস্য, অকর্মণ্যতা, অপদার্থতা ও অক্ষমতার জন্য অনুতাপের জ্বালা হইলে তার এতটা কষ্ট হইত না। নিজে সে কিছু করিতেছে না, তা যেন নয়। কিছু করিতে পারিতেছে না, তা'ও নয়। কিছু হইতেছে না। কোন এক অজ্ঞাত অকারণে জীবনের কোন এক অনির্দিষ্ট অনিয়মে, ব্যর্থতা না ঘটিয়াও সার্থকতার অভাবটা স্থায়ী হইয়া যাইতেছে।

আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয় নাই। নষ্ট হইলে বোধ হয় ভালই হইত— কিছুদিনের জন্য নষ্ট হইলে। আগুনে লোহা পোড়ানোর মত এ বিপদ ছাড়া মানুষের চলে না। ত্রিষ্টুপ যে জানে একদিন সে সাফল্য লাভ করিবেই করিবে, এই জানাটাই তাকে ঠাণ্ডা লোহার মত কঠিন করিয়া রাখিয়াছে, নূতন অবস্থার উপযোগী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ সঞ্চয় করিতে দিতেছে না। আগে নিজেকে নূতন জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ার উপযোগী করিতে না পারিলে, নিজের চেষ্টায় কে নূতন জীবন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে? কিছু ঘটিবে না, এ ভয় ত্রিষ্টুপের নাই। কিছু ঘটিতেছে না বলিয়া ভয়ার্ত ব্যাকুলতার বিশ্রী অনুভূতিটাই শুধু সে বোধ করিতেছে, পথ খুঁজিবার তাগিদ পাইতেছে না। এ তো মনের বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

রাজকন্যা ও রাজকুমারের মিলনে রূপকথার শেষ জানিয়াও কাহিনীর মাঝখানে কুমারের বিপদের পর বিপদ ঘটার সময়ে অসহায় ক্ষোভে কাতর হওয়া চলে। নিজের মনের রূপকথায় নিজের এখনকার দুরবস্থায় ত্রিষ্টুপ অনায়াসে উদ্বিগ্ন হইতে পারিয়াছে।

বেতনের সমস্ত টাকাই ত্রিষ্টুপ বাপের হাতে তুলিয়া দেয়, অবিনাশ পঞ্চাশ টাকা রাখিয়া তাকে পঁচিশ টাকা ফেরত দেন। এটা প্রায় নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ত্রিষ্টুপের মনটা খুঁতখুঁত করে। হাত-খরচের জন্য অবিনাশ তাকে পঁচিশ টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফিরাইয়া দিবেন, কিন্তু সে জানে ওই টাকাটা কাটিয়া রাখিয়া বাকি বেতনটা সে যদি অবিনাশের হাতে দেয়, একটু তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন। টাকার পরিমাণের জন্য নয়, তার দরকার আছে জানিলে সব টাকাই তিনি অনায়াসে ফিরাইয়া দিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রথমে তার টাকাগুলি তাঁর হাতে তুলিয়া দেওয়া চাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই ধরণের তুচ্ছ খুঁতগুলি চিরদিন ত্রিষ্টুপকে পীড়া দেয়।

টাকাপয়সা সম্পর্কে আর একটা পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা ত্রিষ্টুপ সঞ্চয় করিয়াছে। চাকরী পাওয়ার পর রমেশ বার তিনেক তার কাছে টাকা ধার করিয়াছে। সাহায্য নয়,—ঋণ, পরে শোধ করিবে। শেষবার সে যখন কুড়িটি টাকা ঋণ চাহিল, ত্রিষ্টুপের হাতে একেবারেই টাকা ছিল না।

‘বাবার কাছ থেকে চেয়ে দিচ্ছি।’

‘বাবার কাছ থেকে? তা’—আমার নাম ক’রো না কিন্তু ভাই।’

‘বাবা তো জিজ্ঞাসা করবেন কি জন্য টাকা চাই?’

‘বলো তোমার নিজে দরকার। নয় তো বলো কোন বন্ধু ধার চেয়েছে। আমার নাম করো না, সে ভারী বিশ্রী ব্যাপার হবে।’

রমেশের বেকার অবস্থার জন্য ত্রিষ্টুপের বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। নিজে সে হাতে পাওয়া চাকরী ছাড়িয়া দেওয়ার কথা ভাবে, সে বিশ্বাস করিত না যে চেষ্টা করিলে কোন মানুষের পক্ষে দিন চলার মত সামান্য উপার্জন করা অসম্ভব। রমেশের অবস্থার জন্য রমেশকেই সে দায়ী করিয়া রাখিয়াছে। তবু প্রভার স্বামী টাকা যখন চাহিয়াছে, না দিলে চলিবে না। বিরক্তিতে মন ভরিয়া অবিনাশের কাছে টাকা চাহিতে গেল।

অবিনাশ বলিলেন, 'কুড়ি টাকা? কি করবি কুড়ি টাকা দিয়ে?'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'দরকার আছে।'

মা বললেন, 'অত খরচে হসনে তিষ্টু।'

অবিনাশ বলিলেন, 'দরকার আছে জানি। কি দরকার আছে শুনি না?'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'কি দরকার না জানলে টাকা দেবে না?'

অবিনাশের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। আহত বিস্ময়ে তিনি ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মার হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল।

'টাকা দেব না বলিনি তো, তিষ্টু। টাকা দিয়ে কি করবি তাই শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

ত্রিষ্টুপও তা জানে। অবিনাশের শুধু জিজ্ঞাসা, আর কিছু নয়। কুড়ি টাকার বদলে কুড়ি পয়সা চাহিলেও, অবিনাশ এমনি ভাবে জানিতে চাহিতেন পয়সাটা কি কাজে লাগিবে। বাড়ীর বাহিরে যাইতে দেখিলে যেমন জিজ্ঞাসা করেন সে কোথায় যাইতেছে, এও তেমনি জিজ্ঞাসা।

তার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত ছোট-বড় সব খবরই ওঁরা রাখিয়াছেন; প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না এমন কিছু তার জীবনে উপস্থিত হইয়াছে, এ ধারণাই ওদের নাই। ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া

বুঝিতে পারিয়া মনটা ত্রিষ্টুপের বড় খারাপ হইয়া গেল। টাকা সে নিক, খরচ সে করুক, সেটা ভিন্ন কথা। কিসে টাকা খরচ করিবে, একটু জানিবার অধিকার তার বাপ-মা দাবী করেন। টাকা যদি সে নষ্ট করিতে চায়' তাও সে করুক। কিছু না বলার চেয়ে সে অনেক ভাল! এ গোপনতার মানেই স্পষ্ট ভাষায় তার ঘোষণা করা যে, এতদিন যা করিয়াছ, বেশ, করিয়াছ, এখন হইতে আমার সমস্ত বিষয়ে তোমরা মাথা ঘামাইতে আসিও না। শুধু অবিনাশের একটি প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করায় আজ মতের অমিল, অবাধ্যতা আর কলহের চেয়েও বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

হাতে দেওয়ার বদলে টাকাটা ত্রিষ্টুপ রমেশের সামনে ফেলিয়া দিল। ইচ্ছা করিয়া নয়, মনে অশ্রদ্ধা থাকিলে, সময় বিশেষে আপনা হইতেই সেটা প্রকাশ হইয়া যায়।

রমেশ বলিল, 'শীগ্‌গির তোমার টাকা ফিরিয়ে দেব ভাই, এক মাসের মধ্যে। কত যেন হল সব শুদ্ধ ?,

টাকাটা ওভাবে ছুঁড়িয়া দিয়া ত্রিষ্টুপ একটু অনুতাপ বোধ করিয়াছিল, রমেশের অমায়িকতা দিয়া অপমান চাপা দিবার চেষ্টায় আবার তার পিত্ত জ্বলিয়া গেল।

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।'

তখন উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া চোখ পাকাইয়া রমেশ বলিল, 'তার মানে ? ও রকম বাঁকা করে কথা বলছ যে ?'

'বাঁকা করে কি বললাম ?'

'বুঝি, বুঝি। আমরা ও সব বুঝি। ভাবছ যে ধার বলে নিচ্ছে, তার মানেই তাই। কাজ নেই ভাই তোমার টাকা নিয়ে আমার, বরং কাবলীওয়ালাকে খত লিখে দেব।'

দিন সাতেক পরে ত্রিষ্টুপ আপিস হইতে বাড়ী ফেরা মাত্র প্রভা একতাড়া নোট হাতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ত্রিষ্টুপকে দেখাইয়া নোটের তাড়া হইতে পঁচিশ টাকার নোট বাছিয়া সামনে ফেলিয়া দিল।

'তোমার টাকা।'

'সুদ কই?' ত্রিষ্টুপ হাসিবার চেষ্টা করিল। এদের বিকৃত অভিমানের পরিচয় তো সে জানে, কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পাইল না।

নোটের তাড়াগুলি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে প্রভা নিজেই বলিল, 'চিরকাল কারো সমান যায় না। দু'দিন অবস্থা একটু খারাপ হলে কি রকম যে করে সবাই! সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে যেন ফতুর করে দিল।' প্রভার চোখ জলে ভরিয়া যায়, 'মনে থাকবে সব, কত লাথি, ঝাঁটা, অপমান জুটেছে। এতদিন চুপ করে সব সয়েছি, আর তো চুপ করে থাকব না।'

লাথি, ঝাঁটা, অপমান। চুপচাপ সব সহ্য করা। হাসিবে না কাঁদিবে, ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল না। সারাদিন প্রভা সকলের সঙ্গে ঝগড়া করিল। বাপ-মাকে কাঁদাইল এবং নিজেও কাঁদিল। সকলকে সে আঘাত করিতে চায় না, প্রমাণ করিতে চায় যে, এতদিন সকলের কাছে তার শুধু অনাদর আর অপমানই জুটিয়াছে। রমেশের চাকরী থাকিলে বাপের বাড়ীতে দিন কাটানোর সময়ে সকলের যে কথা ও ব্যবহার তার কাছে সহজ ও স্বাভাবিক ঠেকিত, রমেশের চাকরী ছিল না বলিয়াই সেই কথা ও ব্যবহারের মধ্যেই এতকাল কিছু আবিষ্কার করিয়া সে অভিমান করিয়াছে। নিজের এই বিকারকে সে সমর্থন করিতে চায়। সেই চেষ্টায় একেবারে হুলস্থুল কাণ্ড বাধাইয়া দিয়া সে রমেশের সঙ্গে চলিয়া গেল।

রওনা হওয়ার আগে রমেশ অবিনাশকে বলিল, 'আপনার খুব টাকার টানাটানি চলছে শুনছিলাম?'

অবিনাশ বলিলেন, 'কই না? চলে যাচ্ছে এক রকম! তিষ্টুর চাকরীটা হয়ে—'

'আমি কিছু টাকা দিলে কি আপনার অপমান হবে? আমি তো আপনার ছেলের মত।'

অবিনাশের মনে ছিল না; কিন্তু ত্রিষ্টুপের এখন মনে পড়িয়া গেল, রমেশ টাকা ধার চাহিতে আসিলে, তিনি টাকা ধার দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'ধার দিতে পারব না, বাবা। ধার চাওয়াটাও তোমার উচিত হয়নি। তুমি এমনি টাকা নাও। আমার কাছে টাকা নিতে তোমার অপমান কি? তুমি তো আমার ছেলের মত।' ছেলের মত বলিয়া তাকে ধার দেওয়ার বদলে একেবারে দান করিতে চাওয়ায় রমেশের রাগ হইয়াছিল। এতদিন সেই রাগ মনে পুষিয়া রাখিয়াছে, আজ সেই ঝাল মিটাইতে চায়।

ত্রিষ্টুপের যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল। এক বিষয়ে এত তীক্ষ্ণ মান অপমান জ্ঞান, এত তেজ, অথচ সবটাই বিকার। কতকগুলি বিষয়ে মানুষটা সুস্থ ও স্বাভাবিক, আবার কতকগুলি বিষয়ে এমন খাপছাড়া বলিবার নয়। বেকার জীবন কি এমনি সব মানসিক রোগের সৃষ্টি করে?

অবিনাশ আনন্দ ও আবেগে রমেশের হাত চাপিয়া ধরিলেন। —'না বাবা, অপমান কিসের! এখন তো দরকার নেই, দরকার থাকলে তোমার কাছ থেকে নিতাম বৈকি। নিজে চেয়ে নিতাম।'

খোঁচাটা বিঁধিল না দেখিয়া রমেশ বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই চলিয়া গেল।

কোথায় কি কাজ সে পাইয়াছে, এত টাকা হঠাৎ সে কোথা হইতে পাইল, এ সব স্পষ্ট করিয়া কিছুই তার কাছে জানা গেল না। প্রশ্ন করিয়া পাওয়া গেল শুধু ভাসা ভাসা জবাব। ঠিক চাকরী নয়, এজেন্সীর মত কি যেন তার একটা জুটিয়াছে।

ত্রিষ্টুপের মনে আঘাত লাগিল বৈকি! স্বামীর ধার করা পঁচিশটা টাকা তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া প্রভা তাকে যে ভাবে আঘাত করিতে চাহিয়াছিল সে ভাবে নয়। রমেশের অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনটাই তাকে যেন ঝাঁকি দিয়া গেল। রমেশ অপদার্থ, জীবনে কোনদিন তার অভাব ঘুচিবে না, এই ছিল মানুষটা

সম্বন্ধে তার ধারণা। কেবল পরিবর্তন নয়, নিজের অবস্থায় খুব ভাল রকম পরিবর্তনই সেই রমেশ করিয়াছে। তার কাছে মনে হইতেছে আকস্মিক, কিন্তু এ উন্নতি হয়তো রমেশের অনেক দিনের চেষ্টার ফল।

স্বামীর সঙ্গে বিদায় হইয়া যাওয়ায় তিন চার দিন পরেই প্রভা একবার এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, যাওয়ার দিন যে কাণ্ড করিয়া গিয়াছিল সেজন্য সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে।

ক'দিনের মধ্যে গায়ে গয়না চাপানোর সুযোগ সে পায় নাই, তবে নূতন যে কাপড়খানা পরিয়া আসিয়াছে তার দাম অনেক। তাকে পৌঁছিয়া দিতে গেল ত্রিষ্টুপ। প্রভাই এক রকম জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। রমেশ একটি সুশ্রী নূতন বাড়ী ভাড়া করিয়াছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটা আসবাব কিনিয়াছে দামী দামী। এতদিনের পুরাণো জিনিষ-পত্রের গায়ে আঁটা দারিদ্র্যের পরিচয়ের মধ্যে স্বচ্ছলতার আরও অনেক চিহ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রভার কপাল ফিরিয়াছে ভাবিয়া এক দিকে ত্রিষ্টুপের বুকটা যেমন হাল্কা হইয়া গেল,—অন্য দিকে রমেশের মত মানুষ যা পারিয়াছে নিজে সে তার চেষ্টা পর্যন্ত সুরু করিতে পারিল না ভাবিয়া মন তার ভারি হইয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল, তার দ্বারা বোধ হয় কিছু হইবে না। সে শুধু কল্পনা করিতে জানে, তার শুধু স্বপ্ন দেখা। নিজে সে অক্ষম, অপদার্থ। নিজের সম্বন্ধে ধারণাটাই শুধু তার বড়।

আত্মবিশ্বাসে আগুন লাগার তাপে পুড়িতে পুড়িতে তার দিন কাটিতেছিল; এক সপ্তাহ পরে রমেশকে পুলিশে ধরিয়া নিয়া গেল এবং প্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল বাপের বাড়ী। ত্রিষ্টুপের মনে হইল, একটা চোখে যেন এতদিন তার দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ সেই পুরাতন অন্ধ চোখে নূতন দৃষ্টি আসিয়াছে।

॥ পাঁচ ॥

প্রথম কিছুদিন আপিসের কাজ করিতে ত্রিষ্টুপের ভালই লাগিল। জীবনে এ তার একটা নূতন অভিজ্ঞতা—অনেকের সঙ্গে কলম পিষিয়া পয়সা উপার্জন করা। নূতন সাথী, নূতন আবেষ্টনী। প্রথম কয়েক দিন সে ঘাড় গুঁজিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটানা কাজ করিয়া যাইত, মনোযোগের ছোট ছোট বিরামগুলিতে এই ভাবিয়া গভীর তৃপ্তি অনুভব করিত, সে কাজ করিতেছে, কাজ! তার ছোট ঘরখানাতে বিছানায় চিৎ হইয়া দেশবিদেশের চিন্তাবিদ্‌দের ছাপানো মতামতের চিন্তায় মগজ বোঝাই করার ছলে অমন বেকার জীবন যাপন করার বদলে, নিজের চিন্তা ও কল্পনার জাল বোনার বদলে কিছু একটা কাজ করিতেছে। গৃহের অসুস্থ মনে তার যেন আপিসে চেঞ্জ আসিয়াছে। এ যেন প্রায় মুক্তির সমান।

প্রকাণ্ড একটা টেবিল ঘিরিয়া দশ জন কর্মী বসে; তাদের মধ্যে সে স্থান পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে আরও অনেকগুলি ছোট-ছোট টেবিলে আরও অনেক সহকর্মী আছে। মাঝে-মাঝে চোখ তুলিয়া ত্রিষ্টুপ চারিদিকে তাকায়। ঘরের সোঁদাগন্ধী গরম বাতাসের ঘনত্ব যেন অনুভব করা যায়, দুটি ফ্যান পাক খাইতে খাইতে অবিরাম এলোমেলো আলোড়ন বজায় না রাখিলে বাতাস যেন আরও গাঢ় হইয়া জমিয়া যাইত। দেওয়ালের গা ঘেঁসিয়া বসানো প্রায় ছাতের সমান উঁচু কাঠের তাকগুলিতে গাদা করা কাগজপত্র—কত মানুষের কত দিনকার কত পরিশ্রমের ফল কে জানে!

আপিসের কয়েক জনের সঙ্গে ত্রিষ্টুপের একটু একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে।

'মুগ্ধবোধ নকল করছেন নাকি মুগ্ধ হয়ে?'

ত্রিষ্টুপ মুখ তুলিয়া একটু হাসে। টেবিলের অপর দিকে তার মুখোমুখি বসে সত্যেন। বয়স ত্রিষ্টুপের চেয়ে বেশী নয়—অভিজ্ঞতা বেশী। বছর তিনেক কাজ করিতেছে। একমাথা কোঁকড়া চুলে তার সাধারণ চেহারাটিকে একটু-অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ত্রিষ্টুপের মনে হয়—তার চুলগুলি হঠাৎ ওরকম অসাধারণ হইয়া গেলে লজ্জায় সে কারও কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না।

'হুঁ হুঁ বাবা, মোহমুদ্গরের গুঁতো তো লাগেনি, টের পাবেন!'

ডান পাশে বসে নিকুঞ্জ। বেঁটে, মোটা, মাঝবয়সী, ধীর স্থির মানুষ, ছোট ছোট চোখ দুটি কেবল সর্বদা পিট পিট করে। সে নাকি নূতন বিবাহ করিয়াছে, দ্বিতীয়বার। আধময়লা জামাকাপড় পরিয়াই কিন্তু সে আপিসে আসে, কেবল তেলে ভেজা চুলে সযত্নে টেরি-কাটা আর কামানো মুখে স্নো পাউডার লাগানো ছাড়া তার আর কোন বাহার নাই। মাথার সুগন্ধি তেলের গন্ধটা সর্বদাই ত্রিষ্টুপের নাকে লাগে।

'অত স্পীডে কাজ করবেন না মশায়, মারা যাবেন শেষে। যত শীগ্‌গির শেষ করে দেবেন, তত কাজ ঘাড়ে চাপাবে। এক দম থই পাবেন না।'

টাইপিস্ট ধীরেন। একটি ফুলস্ক্যাপ শীটে কয়েক লাইন টাইপ করিয়া টাইপরাইটার যন্ত্রের চাবীগুলিতে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে চাবীগুলিতে বিদ্যুৎবেগে তার আঙুলের সঞ্চালন ত্রিষ্টুপ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু ধীরেন একটানা আঙুল চালায় না, মিনিট দুই-তিন টাইপ করিয়া আট-দশ মিনিট বসিয়া থাকে, গল্প করে আর ইয়ার্কি দেয়। মাঝে মাঝে দশ বিশ মিনিট দ্রুত একটানা টাইপ করিয়া হাতের কাজ শেষ করিয়া, কাগজগুলি ঘণ্টাখানেক ফেলিয়া রাখে, তারপর ধীরে সুস্থে কর্তাদের কাছে পাঠাইয়া দেয়। মন্থর গতিতে সে টাইপ করিতে

পারে না, আঙ্গুল বাগ মানে না। তিন মাসের মধ্যে আপিস একঘেয়ে হইয়া উঠিল।

এমনিভাবে এক একটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নূতন নূতন মানুষের পরিচয় পাইয়া, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের সকরুণ অন্তহীন লড়াই দেখিয়া, নিজের জীবনে বৈচিত্র্য আসার আনন্দ ও উৎসাহ ত্রিষ্টুপ অনুভব করিতে লাগিল। বড় কিছু না হোক, এ ছোট কাজই বা মন্দ কি? এ কাজেও তো মানুষ মসগুল হইয়া যাইতে পারে।

প্রথম ত্রিষ্টুপের কাছে ধরা পড়িল—কাজ সহজ, অতি সহজ। তারপর ধরা পড়িল—এই সহজ কাজ করিতে তার সময় লাগে দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত, কোন কোন দিন তার চেয়েও বেশী। স্কুলের ছেলে অনায়াসে যা পারে, সেই কাজ করিতে তার এত সময় খরচ হয়।

বাহিরে আকাশ-ছাওয়া মেঘের বর্ষণ চলিয়াছে, দিন দুপুরে ঘরে জ্বালা হইয়াছে আলো। পাখা বন্ধ, হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাসে সোঁদা গন্ধটা ভিজা ভিজা মনে হয়। ঘরের সকলের মুখে মুখে ত্রিষ্টুপ চোখ বুলায়—বন্দীত্বের অনুভূতি তাকে যে-কষ্ট দিতেছে কারোও মুখে কি তার একটু ছায়া সে দেখিতে পাইবে না? কুড়ি পঁচিশ বছর বয়সের যে সাত-আট জন আছে, তাদের মুখে? মনটা হু-হু করিতে থাকে। সে একা, তার কেহ নাই, সকলে তাকে ত্যাগ করিয়াছে। পাওয়ার মত কিছুই সে পায় নাই, জীবনে কোন দিন পাইবে না।

নতুন মাসের গোড়ায় এমনি বাদলার দিনে বেতন পাওয়া গেল। ছুটির সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন, ধীরেন, আর নিকুঞ্জ তাকে ঘিরিয়া ধরিল।

'কদ্দিন দেনা ফেলে রাখবেন ত্রিষ্টুপবাবু? আজ আর ছাড়ছি না। বেশ বাদলার দিনটা আছে।"

চাকরী হওয়ার জন্য এরা একদিন খাওয়া দাবী করিয়াছিল। ত্রিষ্টুপের মনে ছিল না।

'নিশ্চয়। বলুন কি খাবেন?'

চার জনে সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিতেছে, অবিনাশ পিছন হইতে ডাকিলেন, 'ত্রিষ্টুপ?'

ত্রিষ্টুপ কাছে গেল।

'টাকাগুলো দিয়ে যা, আমার একটু দেরী হবে যেতে।'

'বাড়ী গিয়ে দেব। ক'জন বন্ধু ধরেছে, খাওয়াতে হবে।'

'ত্বটো টাকা রেখে বাকীটা দিয়ে যা। অতগুলো টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবি? যা অসাবধান তুই! আর শোন'—অবিনাশ গলা নামাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, 'সংক্ষেপে সেরে দিস, অমন বন্ধু ঢের খেতে চায়। একটা চপ কি কাটলেট আর এক কাপ চা—ব্যস! এক টাকাতেই হয়ে যাবে। তবু তুইটা টাকাই বরং রাখ—'

'বাড়ী গিয়ে দেব'খন!'

ত্রিষ্টুপ তর-তর করিয়া নামিয়া গেল। অবিনাশ আহত বিস্ময়ের সঙ্গে ছেলের দিকে চাহিয়া থ' বনিয়া রহিলেন।

ত্রিষ্টুপ ছাড়া তিন জনেই আজ যেন একটু বেশী উত্তেজনাপ্রবণ। নিজেদের কথা আর হাসি তামাসার মধ্যেই তিন জনে যেন রসের অন্ত পাইতেছে না; বিশেষ করিয়া কেরাণীবাবুদের জন্য পরিচালিত এই সস্তা রেস্তোঁরার চপ-কাটলেট আর চা খাইতে খাইতে জীবনকে উপভোগ করিতে মসগুল হইয়া। ত্রিষ্টুপ কথা বলিল, হাসিতেও যোগ দিল, কিন্তু তিন জন ও এক জনের তুটি দল মিশ খাইতে পারিল না কোন রকমেই। এবং ত্রিষ্টুপের দলে ভেরার ব্যর্থ চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে সকলের উৎফুল্ল ভাবটাও কেমন যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

রাস্তায় নামিয়া তিন জন চুপি চুপি কি যেন বলাবলি করিল নিজেদের মধ্যে, তারপর নিকুঞ্জ বলিল, 'অ, ত্রিষ্টুপবাবু, বলি বাড়ী যাবেন নাকি এখন ?"

'কোথা আর যাব বলুন ?"

'আমাদের সঙ্গে আসুন না, একটু ফুর্তিটুর্তি করা যাক ?'

ধীরেন বলিল, 'মাইনে পাবার পর আমরা একদিন একটু জমাই, ত্রিষ্টুপবাবু।'

সত্যেন বলিল, 'কাল ছুটিও আছে।'

ত্রিষ্টুপের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। মানুষের সঙ্গে সে মিশিতে পারে না, সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে! সঙ্গীহীন অসহায়ের দুর্বোধ্য ভয়টাও পীড়ন করিতেছিল। উগ্র অন্ধ হিংসায় বন্ধু তিনজনকে আঘাত করিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

সন্ধ্যার বেশী দেরী নাই। টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষার অতি অমায়িক রূপ ও ব্যবহার। ওরা ফুর্তি করিতে চায়—ফুর্তি! আজ কি তা' সম্ভব ? তার পক্ষেও ?

নিকুঞ্জ বলিল, 'আমরা চাঁদা করে খরচ দি' যা খরচ হয়, চারজনে সমান সমান দেব। আসবেন ?'

'কত লাগবে ?'

'গোটা দশেক টাকা, আর কতো ?'

দশ টাকা! এক সন্ধ্যার ফুর্তির জন্য দশ টাকা খরচ!

কিন্তু ওরা যদি পারে, সে কেন পারিবে না ? হাজার হাজার টাকা সে একদিন উপার্জন করিবে, দশ টাকা খরচের নামে তার চমক লাগে ? ধিক!

'চলুন যাই।'

পরদিন অনেক বেলায় ত্রিষ্টুপের ঘুম ভাঙ্গিল একটা অস্থিরতার

মধ্যে। রাত প্রায় একটায় সে বাড়ী ফিরিয়াছিল। বাড়ীর সকলে জাগিয়াছিল তার প্রতীক্ষায়। দরজা খোলার পর ভিতরে আলোয় অসিয়া দাঁড়াইলে তার চেহারা দেখিয়া মা চাপা সুরে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন, ত্রিষ্টুপের মনে আছে। অবিনাশ কি যেন একটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দাঁড়ায় নাই, কোন মতে ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পৃথিবীর এলোমেলো টানে পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে দু'হাতে চৌকীর প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ চিৎ হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। তারপর এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

জলকাদায় পিছল সরু গলিতে ঢোকার পর হইতে সুরু হইয়াছিল তার ফুর্তি—দারুণ ভয়, উদ্বেগ ও প্রত্যাশার উত্তেজনায়। তারপর এক দেয়ালচাপা বাড়ীর দোতলায় ছোট একটি ঘর—আলো আর ঠাসা আসবাবে সাজানো ঝলমল অদ্ভুত একটি ঘর। আর একটি মেয়ে—ঘরের মতই যার একটি ছোট দেহে দশটি দেহের গাদা করা সাজসজ্জা। তারপর নেশা—জীবনে প্রথম মদের নেশা। চাপা কষ্ট আর তীব্র উন্মাদনার অদ্ভুত সমাবেশ—মাটির ভয়ঙ্কর টানে অবলম্বনহীন শূন্যে অবিরাম পড়ার মত শেষের দিকে নিকুঞ্জ ধেই-ধেই নাচিয়া ফুর্তি করিয়াছিল—বেঁটে-মোটা, ধীর-শান্ত নিকুঞ্জ, অল্পদিন আগে যে বিবাহ করিয়াছে দ্বিতীয় বার। কেমন মেয়েকে সে বিবাহ করিয়াছে? কুন্তলার মত?

ঘরের সেই মেয়েটিকেও শেষের দিকে কুন্তলার মত মনে হইয়াছিল। কতবার সে যে নিজের মাথায় ঝাঁকি দিয়াছে! কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র, কি বীভৎস একটি রাত তার কাটিয়াছে কাল; একটু মদ খাওয়া ছাড়া কিছুই সে করে নাই চুপ চাপ বসিয়া শুধু চাহিয়া রহিয়াছে। তবু তার মনে হইয়াছে, মুহূর্তে মুহূর্তে সে যেন উপার্জন করিতেছে এক অক্ষয় অমর সম্পদ। অভিজ্ঞতা নয়, চেতনার জাগরণ নয়, জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টতা, জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপন।

মাথা টন্‌টন্‌ করিতেছে, সমস্ত শরীরে জ্বর-ছাড়া বিশ্রী অবসন্নতা বোধ করিতেছে। তবু তার আপশোষ নাই। সে ভুলিতে পারিতেছে না যে রহস্যময় জীবনের একটি ধর্ম সে আবিষ্কার করিয়াছে। মৃতপ্রায় মানুষও বিদ্রোহ করে, করিতে পারে। অবস্থার চাপে, শিক্ষা-দীক্ষা-আবেষ্টনীর চাপে, স্বাস্থ্যহীন শুষ্ক নীরস একঘেয়ে জীবনের চাপে, মানুষ যত প্রাণহীণ নিস্তেজ হোক, বিদ্রোহের প্রেরণা তার মরেনা। তার সহকর্মী তিন জন তাই বেতন পাওয়ার পর মাসে একদিন ফুর্তি করে আর কোন পথ খুঁজিয়া পায়না, তাই এই ভীরু দুর্বল মানুষ তিনটি এই ভাবে বিদ্রোহ করে। একঘেয়ে, নিরুপায়, অবসন্ন জীবন যাপনের বিরুদ্ধে, দিনের পর দিন কলের মত সুবোধ সুশীল ভাল মানুষ হইয়া থাকায় বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান মাত্র মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, বইয়ের সেল্‌ফটা ধরিয়া ত্রিষ্টুপ ভাবে, তা হোক। এ দুর্বলতা কিছু নয়। মন তার সবল হইয়াছে। আর কোন দিন সে হতাশ হইবে না। হতাশা বোধ করিলেও আসিয়া যাইবে না কিছুই, সে শুধু হইয়া থাকিবে হৃদয় মনের একটা বদ অভ্যাস। যতদিন সে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, তার লড়াইয়ের ক্ষমতা আর কিছুতেই নষ্ট হইবে না। নিজের সমস্ত পাওনা আদায় করার চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন লড়াই কোন দিন ভালও লাগিবে না।

নিচে নামিতেই সে সামনে পড়িয়া গেল অবিনাশের। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চাহিয়াই নীরবে সরিয়া গেলেন।

রাণু জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার অসুখ করেছে, মামা?'

প্রভা খোঁটা দিয়া বলিল, 'তুমিও এমনি করে গোল্লায় যাবে, তা আমি আগেই জানতাম। চাকরী বাকরী করে নিজের ভাগ্নীকে একটা জামা পর্যন্ত যে কিনে দেয় না, মদ না খেলে সে খাবে কি!'

অবিনাশ আড়াল হইতে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'চুপ কর প্রভা, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব। পাড়াশুদ্দু লোককে শুনিয়ে চিল্লাচ্ছেন মেয়ে, বোকা বজ্জাত কোথাকার!'

উনানে কেটলী চাপাইয়া মা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রথমে প্রভাকে বলিলেন, 'জামাই তো চুণকালি দিয়েছে মুখে, ভায়ের একদিনের বদখেয়ালটা চেপেই যা না বাছা?' তারপর কাঁদ-কাঁদ হইয়া ত্রিষ্টুপকে বলিলেন, 'না বাবা, তুই লজ্জা করিস নে। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে ওনার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিবি যা। তোর কিছু দোষ ছিল না, পোড়ারমুখো বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে'—

অবিনাশ ইতিমধ্যে আড়াল হইতে সামনে আসিয়াছিলেন, বলিলেন, 'থাক থাক, ওসব কথা বলে আর কি হবে? টাকা যা আছে, দাও তো ত্রিষ্টু্‌। সব উড়িয়ে দাওনি তো?"

ত্রিষ্টু্‌প সমস্ত টাকা আনিয়া অবিনাশের হাতে দিল। মোটে গোটা তের টাকা কম দেখিয়া অবিনাশ স্বস্তি বোধ করিলেন। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া পাঁচটি টাকা ত্রিষ্টু্‌পকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'দরকার হলে চেয়ে নিও।'

ত্রিষ্টু্‌প কিছুই বলিল না।

বেলা তিনটার পর জামা কাপড় পরিয়া সে বাহির হইয়া গেল। কুন্তলার দিদির বাড়ীতে গিয়া সে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিবে। মনটা কেমন অশান্ত হইয়া আছে, ওবাড়ীর শান্তিপূর্ণ আবেষ্টনী আর দু'টি শান্ত ও সুখী মানুষের সঙ্গ হয় তো তার মনটাকেও শান্ত করিয়া দিবে।

বাহিরে যাওয়ার আগে ত্রিষ্টু্‌প শুনিয়া গেল মা বলিতেছেন, 'এত বড় সোমত্ত রোজগেরে ছেলে, কদ্দিন থেকে বলছি একটা বিয়ে থা দিয়ে দাও—'

আর অবিনাশ বলিতেছেন, মেয়ে তো খুঁজছি—'

মেয়ে খুঁজিতেছে মেয়ে! তার বাপ তার জন্য মেয়ে খুঁজিতেছে! এমন হাস্যকর রকমের অশ্লীল ঠেকিল কথাটা ত্রিষ্টুপের কাছে। তার হইয়াছে বয়সকালের রোগ, সেজন্য এই ঔষধ প্রয়োজন। এর বেশী আর কি কিছু ভাবিয়াছে অবিনাশ? তার মা? মেয়ে খুঁজিয়া আনিয়া দিলে যথানিয়মেই সে প্রিয়া, সাথী, জননী ও গৃহিণী হইবে, এটা জানা কথা। কিন্তু জানা কথাটাও কি মনে পড়িয়াছে ওদের? মেয়ে বলিতে যে মানবজাতীয়া জীব বুঝায়, তাও বোধ হয় খেয়ালে আসে নাই।

এই ভাবে কিছু ভাবিতে গেলেই আগে ত্রিষ্টুপ গভীর জ্বালা বোধ করিত, মনে হইত মানুষ বড় হীন, জীবনে শুধু ক্লেদ! আজ মৃদু আপশোষের সঙ্গে সে শুধু কৌতুক অনুভব করিল। বাড়ীতে নাই বলিয়াই যে বাজারে সে মেয়ে ভাড়া করিয়াছে, একথা মনে করার জন্য বাড়ীর লোকের উপর রাগ করা চলে না। এরকম করে বৈকি মানুষ, বাড়ীতে বৌ থাকিলে পর্যন্ত করে, নয়তো ভাড়া করার জন্য এত মেয়ে সংসারে থাকিত না। তাকে মহাপুরুষ মনে করিবার কোন কারণ বাড়ীর লোকের নাই। এটা তার ব্যক্তিগত অপমান নয়। সংসারে এরকম অনুচিত বাস্তবতা থাকাটা মানুষেরই অপমান। একি ভয়ানক কথা যে যুবকদের চরিত্র সম্বন্ধে মানুষকে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়, ধরিয়া রাখিতে হয় যে, গোল্লায় যাওয়াই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক! এই ব্যাপারটাই ত্রিষ্টুপের বড় খাপছাড়া মনে হয়। এরকম অভাব মানুষ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে কেন, মানুষের স্বভাব যাতে বিগড়াইয়া যায়? চরিত্র একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়? তার জন্মের অনেক আগেই এ সব ঠিক করিয়া রাখা উচিত ছিল। এতকাল মানুষ তবে কি করিয়াছে?

এটুকু ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে যে এসব অভাবের ফল, মাসকাবারের পর আপিসের তিন বন্ধুর ফুর্তি করার বিকৃত সখ ওই ধরণের বিকার। কিন্তু তার কতখানি তনুগত আর কতখানি মানসিক অভাব-বোধের

চাপ, ঠিক কি ধরণের সেই অভাব এবং তার কারণ কি, এসব সে ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ত্রিষ্টুপ ভাবে, অবসর মত দু'চারখানা বই পড়িতে হইবে এ বিষয়ে।

মণীশ বলিল, 'এমন দিশেহারা হলে কিছু হয় না, তিষ্টু।'

'দিশেহারা ?'

'তা ছাড়া কি ? আজ ভাবছ, ব্যবসা করে বড় লোক হবে, পর দিন ভাবছ জ্ঞান সঞ্চয় করা বিশেষ প্রয়োজন, আবার সখ চাপছে সমাজের দোষ ত্রুটি সংশোধন করবে, দেশকে স্বাধীন করবে। একটা মানুষ যদি ব্যবসায়ী, বিদ্বান, সংস্কারক, রাজনৈতিক সব কিছু হতে চায়, তার কিছুই হয় না।'

'ওরকম বলেছি নাকি ?'

'একদিন এক কথায় বলনি, নানান দিনের নানা কথাবার্তায় বলেছ।'

ত্রিষ্টুপ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ও কিছু নয়। এ কথা সে কথা মনে হয়েছে বলেছি। কাজের বেলায় যা' ধরব তাই করব।,

'কি ধরবে ? করবে কি করবে না, পারবে কি পারবে না, সে কথা এখন বাদ দিলাম। কি ধরবে ঠিক করেছ, তাই শুনি আগে ?'

মণীশের কথায় মৃদু ব্যঙ্গের সুর ত্রিষ্টুপের কাছে ধরা পড়িল। আগেও মণীশ এই সুরে কথা বলিত, সে ভাবিত এটা তার স্নেহার্দ্র প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গী। সে ছেলেমানুষ বলিয়া মণীশ এভাবে তার সঙ্গে কথা হয়। আজ তার মনে হইল, মণীশ এই ভাবে তার কাছ হইতে শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থন প্রার্থনা করে। আপিসে তার উপরওয়ালা নিরীহ অসহায় ও একান্ত অনুগত তাকে পিঠ চাপড়াইয়া যে ভাবে মিষ্টি সুরে কথা বলেন, তার সঙ্গে মণীশের কথা বলার বিশেষ পার্থক্য নাই।

ত্রিষ্টুপ বিচলিত হইল না। মনের যে পরিবর্তন মণীশের মৃদু তাচ্ছিল্য অনুভব করার ক্ষমতা তাকে আনিয়া দিয়াছে, সেই পরিবর্তনই অনেক কিছু তুচ্ছ করার ক্ষমতাও তাকে দিয়াছে। সে টের পাইয়াছে মণীশের এটা দুর্বলতা।

'কি ধরব ? আমি যা চাই।'

'সেটা কি ?'

'আমার যা নেই, সেই সব।'

'ওতো এক কথাই হল—তোমার যা নেই, তুমি তাই চাও। কিন্তু অভাবের শেষ নেই মানুষের, চাওয়ারও শেষ নেই। দুটো অভাব বেছে না নিলে, তুমি চাইবেই বা কি ? সব অভাব তো মেটে না মানুষের।'

মণীশ ফস্ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল।

ত্রিষ্টুপ হাত বাড়াইয়া বলিল, 'আমায় একটা দিন।'

সিগারেট দিয়া মণীশ একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে চাহিয়া থাকে। ত্রিষ্টুপের শান্ত নির্বিকার, আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবটা তার কাছে এতক্ষণে ধরা পড়িয়াছে।

নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলিতেছে এমনিভাবে ত্রিষ্টুপ তারপর বলিতে থাকে, 'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মনিদা। কিন্তু ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাব না, ঠিক করেছি। ওতে কোন লাভ হয় না। ও বড় গোলমেলে ব্যাপার। ওটা আসলে ভবিষ্যতের হিসাব। কিন্তু একদিন আমি কি চাইব, এখন থেকে সেটা স্থির করে ফেলতে চাই, ধাঁধা লেগে যায়। দশ বছর পরে কি চাইব, আজ কি আমি তা জানি ? কোন একটা আদর্শ ধরতে পারলেও কথা ছিল। কিন্তু আপনি তো আমাকে জানেন, আদর্শের জন্য বেঁচে থাকার ধাত আমার নয়। আমি তাই ভেবেছি, নিজেকে বাঁধব না। আমি ঠিক করেছি, ভবিষ্যৎকে গড়ে উঠতে দেব। আজ আমার কাছে যা সব চেয়ে দামী, সব চেয়ে কাম্য, আমি সেটা পাওয়ার

চেষ্টা করব। সেজন্য যদি ভবিষ্যতের মস্ত কোন পাওয়া ফস্কে যায়, যাবে। বড় ভবিষ্যৎ নষ্ট হবার ভয়ে এতদিন কিছু গ্রহণ করার নামেই আমার আতঙ্ক হয়েছে, যদি বোঝা বেড়ে যায়। এখনও আমি বড় হতে চাই, যদিও ঠিক জানি না ভবিষ্যতটা কি রকম হলে আমি খুসী হব। কিন্তু সব দিক দিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করার সাধ আমার নেই! এখন থেকেই আমি পাওনা আদায় করতে করতে চলব, মনিদা।'

'সে তো ভাল কথা ত্রিষ্টুপ।,

একটু চিন্তিত ও বিষণ্ণভাবেই যেন মণীশ কথাটা বলিল। আজ প্রভাতের অভিনব উপলব্ধি এখন কথায় প্রকাশ করিবার সময়ে ত্রিষ্টুপ মণীশের কাছে সমর্থন পাওয়ার কথা ভাবে নাই, নিজের মনেই বলিয়া গিয়াছে। এখন সে উৎসুক দৃষ্টিতে মণীশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। জানালা দিয়া ঘরে একফালি রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। মণীশ চাহিয়া দেখিতেছে তার সিগারেটের জলন্ত মুখ হইতে নীলাভ ধোঁয়ার আকাবাঁকা ঊর্দ্ধগতি। সে যে কি ভাবিতেছে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

'এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম মনিদা।'

'আমার কাছে? কি ব্যাপার ত্রিষ্টুপ?'

'আমি কুন্তলাকে বিয়ে করতে চাই।'

মণীশ এক মুহূর্তে চুপ করিয়া রহিল।

'তা হয় না তিষ্টু।'

এই অপ্রত্যাশিত জবাবে ত্রিষ্টুপ থতমত হইয়া গেল। অসহায়ের মত প্রশ্ন করিল কেন?'

এতদিন তার জানা ছিল, সে কুন্তলাকে বিবাহ করিবে কি করিবে না, সমস্যা শুধু এই। তার খুসী হইলেই সে কুন্তলাকে বিবাহ করিতে পারে, কারও আপত্তি হওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই ধারণা লইয়াই সে এতদিন নিজের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে

যে এখন বিবাহ করিয়া জড়াইয়া পড়িলে তার কোন মতেই চলিবে না, তা' কুন্তলাই হোক আর যেই হোক। আজ খানিক আগে মনস্থির করিয়া ফেলিবার সময়ে সে ভাবিতে পারে নাই, কেন মণীশ অমত করিবে।

'বোনের বিয়ে দেওয়া সম্পর্কে তুমি তো আমার মতামত জান, ত্রিষ্টুপ। যার সঙ্গে বিয়ে হলে কুন্তলা সুখী হবে, তার সঙ্গেই আমি ওর বিয়ে দেবো।'

ত্রিষ্টুপের মনে হইল—মণীশ যেন তাকে গাল দিয়াছে। তার সঙ্গে বিবাহ হইলে কুন্তলা সুখী হইবে না! সে যে কুন্তলাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে, তাই কি মেয়েটার পরম সৌভাগ্য নয়? মণীশ কি এমনি মূর্খ যে, এই সহজ কথাটা তার কাছে এখনও ধরা পড়ে নাই, তার সঙ্গে বিবাহ না হইলেই চিরদিনের জন্য কুন্তলা অসুখী হইয়া যাইবে? তার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে সুখী হওয়ার উপায় এ জীবনে কুন্তলার আর নাই?

'আমার সঙ্গে কুন্তলা সুখী হবে না?'

'না ভাই। তোমাদের মিল হবে না। ও তোমার যোগ্য নয়?'

মণীশ কি তামাসা করিতেছে তার সঙ্গে? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ত্রিষ্টুপ তার মুখ দেখিয়া মনের ভাব অনুমান করিবার চেষ্টা করে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলে, 'আপনি ওর মত জানেন?'

'মত জানি না; মন জানি।'

'তবে?'

মণীশকে আশ্চর্য হইয়া যাইতে দেখিয়া ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল, প্রশ্নটা একটু গোঁয়ারের মতই করা হইয়াছে। এটা ঠিক প্রশ্ন হয় নাই, হইয়াছে কৈফিয়ৎ তলব। কুন্তলার মনের ভাব কি, সে বিষয়ে যেন কারো কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না; সুতরাং কুন্তলার মন জানিয়াও মণীশ অমত করিতেছে কেন? হঠাৎ একটা কথা ভাবিয়া

ত্রিষ্টুপের বুকের একটি স্পন্দন স্থগিত হইয়া যায়। কুন্তলার মনোভাব সম্পর্কে সে এত নিশ্চিত হইল কিসে? তার জন্য কুন্তলার হয়তো কোন মাথাব্যথা নাই, সবটা তার নিজেরই কল্পনা?

'কুন্তীর সঙ্গে কি তোমার কোন কথা হয়েছে, ত্রিষ্টুপ?

'না।'

'তবে?'

মণীশের পাল্টা প্রশ্নে ত্রিষ্টুপ একেবারে নিভিয়া গেল, মৃদুস্বরে বলিল, 'আপনাকেই জিজ্ঞেস কবছিলাম।'

তা' করোনি ভাই। তোমার কথা শুনে মনে হল আমার চেয়ে কুন্তীব মন তুমিই ভাল জান। এ তো ভারি মুস্কিলে ফেললে তুমি আমাকে।'

'আমাব তাই মনে হয়। অবশ্য আপনি যদি বলেন—'

'আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হবে? আমি হলাম ওর দাদা, গুরুজন। তুমি ভাববে, আমি কিছু জানি না, বুঝি না, কিম্বা জানলেও কর্তামি কবার জন্য ছেলেমানুষী বলে' সব উড়িয়ে দিচ্ছি। তাব চেয়ে এক কাজ করি, ওকে ডেকে দি'। তুমি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ।'

ত্রিষ্টুপ অভিভূত হইয়া বলিল, 'ও ছেলেমানুষ—'

'তবে ওর মনের কথা তুললে কেন?'

মণীশের কণ্ঠের রুক্ষতায় আহত হইয়া ত্রিষ্টুপ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

'সেজন্য ছেলেমানুষ বলি নি। আমি বলছিলাম, আপনার অমত আছে জেনে ও হয়তো মনের কথা বলতে পারবে না।'

মণীশ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'জানো ত্রিষ্টু, তোমার মনের এই জটিলতার জন্যই আমি অমত করছি। সহজভাবে কিছু গ্রহণ করবার ক্ষমতা তোমার নেই। আমার মত আছে, কি অমত আছে, কুন্তী জানবে কি করে? আজ এসে

তুমি প্রথম কথা তুললে। এ বিষয়ে আমরা কখনো আলোচনা করি নি।'

'আমি বুঝতে পারি নি, মনিদা!'

'মুস্কিল তো হয়েছে সেইখানে। সব কথাই তুমি নিজের মত করে' বুঝে নাও। যে ভাবে তুমি নিজে বুঝতে চাও সেই ভাবে।'

এ ঠিক মন্তব্য নয়, সমালোচনা। নিজের সম্বন্ধে এই স্পষ্ট ও কঠোর সমালোচনা স্বীকার করা বা অস্বীকার করার ক্ষমতা ত্রিষ্টুপের ছিল না। নিজের সম্বন্ধে নিজেরই তার কত সংশয় আছে, কত প্রশ্ন আছে। কি করিবে স্থির করিয়া ফেলার সঙ্গে ওসব দ্বিধা সন্দেহের মীমাংসা তো আর হইয়া যায় নাই। কতদিক দিয়া কতভাবে নিজেকে তার আবিষ্কার করিতে হইবে, তাও কি এখনো সে জানে? তার সম্বন্ধে কেউ জোরের সঙ্গে কোন মত প্রকাশ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সত্য কি মিথ্যা, ঠিক করিয়া ফেলিবার মত ভাল করিয়া এখনো সে নিজেকে চেনে না। মণীশের কথায় তার মধ্যে শুধু তীব্র একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, নিজেকে পরাজিত, অক্ষম, অপদার্থ মনে হইতে থাকে। নূতন জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা সুরু করিয়া গোড়াতেই সে হার মানিল। তার প্রথম চাওয়া, প্রথম দাবী ব্যর্থ হইয়া গেল। অথচ কত সহজ সে ভাবিয়াছিল কুন্তলাকে পাওয়া!

'আমি যাই, মনিদা।'

পরিচিত ঘরখানা যেন অপরিচিত হইয়া গিয়াছে। ঘরের বাহিরে যাইবে ভাবিয়া সে আগাইয়া যায় দরজার বদলে জানালার দিকে। জানালার কাছে এক মুহূর্ত বিফলের মত দাঁড়াইয়া থাকে, যেন ভুলিয়া গিয়াছে এবার সে কি করিবে। তারপর হঠাৎ সচেতন হইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হয়।

'তিষ্টু, শোন।'

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ত্রিষ্টুপ দেখিতে পায় মণীশ চিন্তিত ভাবে তার দিকে তাকাইয়া আছে।

'একটু বোসো, ত্রিষ্টু।'

ত্রিষ্টুপ নীরবে বসিয়া পড়িল।

'আমি কুন্তীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওকে জিজ্ঞেস কর, ও যদি রাজী থাকে আমি অমত করব না।'

'আপনিই বরং জিজ্ঞেস করুন।'

মণীশ মৃদু একটু হাসিল। সে ত্রিষ্টুপের ক্ষোভকে পরিণত করিয়া দিল ক্রোধে। খেলা করিতেছে, তার সমস্ত জীবন লইয়া মণীশ খেলা করিতেছে!

'না, তোমার জিজ্ঞেস করাই ভাল, ত্রিষ্টু। আমি জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দেবে আমি জানি। বলবে, 'আমি কিছু জানি নে দাদা, তোমার যা খুসী কর।'

ত্রিষ্টুপ ভাবিল, বটে! কুন্তলার দাদা-ভক্তি এত গভীর!

'তাছাড়া তোমার কথাটাও একটু ভাবতে হবে বৈকি। তুমি ইচ্ছে করলে আমি যা বলেছি কুন্তীকে জানিয়ে দিতে পার, ত্রিষ্টু। ও রাজী হলে আমি অমত করব না।'

মণীশ চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই কুন্তলা ঘরে আসিল।

'বলুন কি ফরমাস আছে!'

'বোসো, কুন্তলা।'

কুন্তলা বসিল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'মনিদাকে বলছিলাম, তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই।'

'ও!' বলিয়া কুন্তলা তার মুখ হইতে দৃষ্টিটা শুধু মেঝেতে নামাইয়া লইয়া গেল।

'তুমি তো জানো আমি তোমাকে—'

'দাদা কি বললেন?' ত্রিষ্টুপের প্রেমনিবেদনে বাধা দিয়া কুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল।

'তোমার মত জানতে বললেন:'

ত্রিষ্টুপ জবাবের প্রতীক্ষা করে। কুন্তলা চুপ করিয়া থাকে।

'মনিদা বললেন, তুমি রাজী থাকলে তিনি মত দেবেন।'

'আমি কিছু জানি নে।'

'তুমি রাজী আছো তো?'

'দাদা যা বলবেন।'

ত্রিষ্টুপ কথা খুঁজিয়া পায় না। কুন্তলাকে তার খাপছাড়া, অদ্ভুত মনে হয়। চোখটি শুধু সে নত করিয়া রাখিয়াছে, কোন উত্তেজনার চিহ্নই তার মধ্যে খুঁজিয়া পায় না। কথা বলিতে গলাটি পর্যন্ত তার একটু কাঁপিয়া যাইতেছে না। অতি তুচ্ছ সাধারণ কথা যেন তারা আলোচনা করিতেছে।

'তোমার ইচ্ছেটা আমায় বলো। তারপর মনিদাকে জানাব।'

'আমার-কোন ইচ্ছে নেই।'

'তোমার ইচ্ছে নেই!'

কুন্তলা চোখ তুলিয়া তার মুখে দৃষ্টি বুলাইয়া দেওয়ালের দিকে চাহিল।

'তা নয়। দাদা যা বলবেন তাই হবে। আমায় কেন জিজ্ঞেস করছেন? আমি কিছু জানি নে।'

'তুমি একি কথা বলছ কুন্তলা?'

'কেন?'

'মনিদা কি তোমার ভাল-লাগা না-লাগা ঠিক করে দেন? তোমার নিজের সখ নেই, সাধ আহ্লাদ নেই? পছন্দ নেই?"

'তা কেন থাকবে না?'

'আমাকে তুমি পছন্দ কর?'

'এ পছন্দের কথা নয়।'

'ভালবাস?'

'তা জানি না।'

খানিক আগে ঘরটা যেমন অপরিচিত ঠেকিয়াছিল, কুন্তলাকে এখন ত্রিষ্টুপের তেমনি অপরিচিত অজানা অচেনা মনে হইতে

লাগিল। কুন্তলা যে কোনদিন তার কাছে এত সহজে বিনা চেষ্টায় এমন একটা ধাঁধাঁ হইয়া উঠিতে পারে, ত্রিষ্টুপ কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

'আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি খুসী হবে ?'

'জানি না ?'

'তুমি তবে রাজী নও ?'

'আমি রাজীও নই, অরাজীও নই। কেন এসব জিজ্ঞেস করছেন আমাকে ? যা বলবার দাদাকে বলুন।'

এ জবাবের পর আর কোন কথা চলে না। আর কিছু বলার সুযোগও কুন্তলা তাকে দিল না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। ত্রিষ্টুপ চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। কি জানা গেল এতক্ষণ জেরা করিয়া ? কিছুই নয় ? তার সম্বন্ধে কুন্তলার অনুরাগ বা বিরাগ নাই, অন্ততঃ আছে কি নাই, কুন্তলা নিজে সে হিসাব রাখে না, এটা অবশ্য জানা গিয়াছে। কিন্তু ও জানা জানাই নয়। একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ত্রিষ্টুপকে পীড়া দিতে লাগিল, সে যেন কি একটা ছেলেমানুষী করিয়াছে—কুন্তলার কাছে করিয়াছে! তার নিজের স্বপ্নকে বাস্তব প্রমাণ করার জন্য শিশুর সঙ্গে তর্ক করার মত ছেলেমানুষী।

মণীশ আসিলে সে ঝাঁঝালো গলায় বলিল, 'মনিদা, এমনি করে আপনি বোনদের মানুষ করেছেন ?

'কেমন করে ত্রিষ্টুপ ?'

'চারিদিক থেকে মনের আঁটঘাট বেঁধে রেখে? আপনি বলে দিলে তবে কুন্তলা বুঝতে পারে ওর কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না !'

মণীশ মৃদু হাসিল।—"তুমি ভুল করছ তিষ্টু। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছ না। কুন্তলার মন স্বাধীন ভাবেই গড়ে উঠেছে। আমি শুধু ওর মনে রোমান্স সৃষ্টি হতে দিই নি। ওকে নিয়ে তোমার মনে যে প্রতিক্রিয়া চলছে, ও তা ধারণাও করতে পারবে না।'

ত্রিষ্টুপ উঠিয়া দাঁড়াইল।

'মনিদা। আমি কুন্তলাকে বিয়ে করব।'

বলিয়া মণীশকে কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ত্রিষ্টুপের মনে হইল, আবার তার চিন্তাজগতে একটা ওলোট পালোট ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, বন্ধুদের সঙ্গে. সেদিন রাত্রে হৈ-চৈ করার পর যেমন হইয়াছিল। মনের অনেকটা আশ্রয় তার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বড় একটা ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে নূতন দৃষ্টির আলোয় আরও কত ছোট ছোট ভুল যে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তার সংখ্যা হয় না। অনেক ধারণা তাকে বদল করিতে হইবে, আয়ত্ত করিতে হইবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্য যাচাই করিবার জন্য শিখিতে হইবে নূতন হিসাব-শাস্ত্র।

সবচেয়ে ভয়ানক কথা এবারের ধাক্কায় তার আত্ম-বিশ্বাস যেন একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

মনে হইতেছে, এ আত্ম-বিশ্বাসের মূল্য কি যা নিজের ভুল ধারণাকেই শুধু প্রশ্রয় দেয়, যা অন্ধ একগুঁয়েমির সামিল ?

কয়েকদিন মনের এলোমেলো গতির কোন হদিস ত্রিষ্টুপ পায় না। কখনো নিজেকে অকথ্য রকমের বিব্রত ও বিপন্ন মনে হয়, কখনো রাগে গা জ্বালা করিতে থাকে, কখনো হৃদয়ের সমস্ত চাপল্য ডুবিয়া যায় গভীর উদাস ভাবের থমথমে ব্যথিত শান্তিতে।

অথচ নিজের মধ্যে যে পরিবর্তনের জন্য সে অপেক্ষা করিয়া থাকে, সে পরিবর্তন আর আসে না। ভিতরে কেবল তোলপাড়ই চলিতে থাকে। আগের বার পরিবর্তন আসিয়াছিল স্পষ্ট ও সুনির্দ্ধারিত, কি করিবে, কোন পথে চলিবে নিঃসন্দেহে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। কি করিবে জানা থাকিলেও, এবার যেন কোন মতেই খেয়াল হইতেছে না কোন পথে চলা দরকার। দিশেহারা ভাবটা কোন মতেই কাটিতেছে না।

কুন্তলাকে সে বিবাহ করিবে।

এটা তার করা চাই। মণীশের মত না থাক, কুন্তলা তাকে পছন্দ না করুক, কুন্তলাকে সে বিবাহ করিবে! এটা জিদের কথা নয়, গোয়ার্তুমি নয়, এই তার সঙ্কল্প। প্রেম চুলোয় যাক, সুখের নীড়ের স্বপ্ন আকাশে থাক। সে পুরুষ, সে কুন্তলাকে চায়। তাই সে কুন্তলাকে বিবাহ করিবে। কুন্তলা তার কাম্য এবং প্রাপ্য—ওকে সে আদায় করিবে। যে ভাবেই হোক।

এ পর্যন্ত কোন গোলমাল নাই। প্রশ্ন শুধু এই—কি ভাবে? নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব তার জোটে না।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানোর প্রক্রিয়া এখনো না জানায় ত্রিষ্টুপ বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে।

মা বলেন, 'তুই কিছু মনে করিসনে বাবা।'

ত্রিষ্টুপ চমকাইয়া ওঠে, 'কি বলছ তুমি?

'বলছি কি, ওঁর নানারকম বাতিক। উনি কি বলেন, কি করেন তাতে তুই রাগ করিসনে বাবা!'

'ও, এই কথা।'

ত্রিষ্টুপ স্বস্তি বোধ করে। প্রথমে তার মনে হইয়াছিল মণীশদের বাড়ী হইতে খবরটা বুঝি এ বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং মা তাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। বলিতে আসিয়াছেন, তুই ভাবিসনে বাবা, কুন্তলার চেয়ে লক্ষগুণে সুন্দরী লেখাপড়া গানবাজনা-জানা বৌ তোর জন্য এনে দেব!

একবার এক মুহূর্তের জন্য ত্রিষ্টুপের মনে হইল, মাকে বলিলে কেমন হয়? মার কাছে তার মনের কথা জানিয়া বাবা যদি মণীশের কাছে নূতন করিয়া বাঙ্গালী প্রথায় আবার প্রস্তাবটা উত্থাপন করেন, কোন ফল হওয়ার আশা আছে কি?

তারপর মণীশের কথা ভাবিয়া ত্রিষ্টুপের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। অত সহজে মণীশের মত বদলায় না। মণীশ শান্ত কিন্তু

বড় শক্ত। না ভাঙ্গিয়া ওকে মচকানো যাইবে কিনা সন্দেহ। তার চেয়ে বরং রমলার সঙ্গে পরামর্শ করিলে কাজ দিতে পারে।

বিকালে ত্রিষ্টুপ রমলাদের বাড়ী যাওয়ার জন্য বাহির হইয়াছে, পথের মোড়ে মণীশের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। হঠাৎ কি যে খেয়াল চাপিল ত্রিষ্টুপের!

'মনিদা?'

'কি খবর তিষ্টু।'

কেমন একটু লজ্জা আর অস্বস্তি বোধ হইতেছে, মুখ তুলিয়া মণীশের চোখের দিকে চাহিতে পারিতেছে না। ত্রিষ্টুপ আশ্চর্য হইয়া গেল, তারও লজ্জা-সঙ্কোচ আছে।

'মা বলছিলেন, কুন্তলাকে একবার দেখতে চান। পাঠিয়ে দেবেন?'

মণীশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

'তুমি কি মাকে বলেছ?'

'না।

'তবে হঠাৎ—?'

'কুন্তলার কথা মাঝে মাঝে মাকে বলতাম—এমনি কথায় কথায়। সেইজন্য হয়তো দেখতে ইচ্ছে হয়েছে মেয়েটি কেমন।' গায়ের জোরে মুখ তুলিয়া ত্রিষ্টুপ সোজা মণীশের চোখের দিকে তাকায়, 'হয়তো অন্য কথাও ভাবছেন, বলতে পারি না।'

'আচ্ছা, কুন্তলাকে বলব।'

'আমার কোন মতলব নেই মনিদা।'

'তোমার কি মতলব থাকবে।'

'আপনি যদি কিছু ভাবেন, আপনার যদি ভয় হয় তাই বলছিলাম।'

মণীশ শান্তভাবে সহানুভূতির সঙ্গে বলিল, 'এখনো তোমার মন শান্ত হয়নি তিষ্টু? এতো ভারি দুঃখের কথা হল।'

ত্রিষ্টুপ প্রাণপণ চেষ্টায় একটা অদ্ভুত হাসি হাসিল। 'না না, ভাববেন না। ওসব কিছু নয়।

রমলাদের বাড়ী পৌঁছানো পর্য্যন্ত সমস্ত পথ ত্রিষ্টুপ শুধু বুঝিবার চেষ্টা করিয়া গেল, হঠাৎ তার এই পাগলামী করার মানে কি? মণীশকে মিথ্যা বলিয়া কুন্তলাকে দু'একবার বাড়ীতে বেড়াইতে আনিয়া তার লাভ কি?

নিজের মনের কথাটা নিজের কাছেই ত্রিষ্টুপের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, আর কিছু নয়, মাঝে মাঝে বাড়ীতে আনিয়া কুন্তলাকে বশ করিবে। যেন সুযোগ পাইলেই মেয়েদের বশ করা যায়।

তারপর চিন্তাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ওরকম বশ করিয়া কি কোন লাভ হইবে মণীশের বোনকে? বশীকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরও কি মণীশের বোন বলিবে না 'আমি কিছু জানি নে, দাদাকে জিজ্ঞেস করুন?' কুন্তলা যে এখন তাকে ভালবাসে না তাই বা কে বলিল! ভালবাসিয়াও হয়তো সে বলিয়াছে, দাদার কথাতেই তার মরণ-বাঁচন, তার নিজের কোন পৃথক্ ইচ্ছা নাই।

মণীশকে ত্রিষ্টুপের রূপকথার দানবের মত মনে হয়—তার রাজকন্যাকে সে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে। এমন ঘুম পাড়াইয়াছে যে, রাজপুত্র আসিয়া জাগাইলেও, সে জাগে না—জাগিয়াও তন্দ্রার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু কুন্তলাকে জাগানো চাই, মণীশের মন্ত্রের প্রভাব ব্যর্থ করা চাই।

যদি চাই—তবে দোষ কি? কি দোষ এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতে, যখন তাকে বিবাহ করা ছাড়া উপায় থাকিবেনা, তার সঙ্গে কুন্তলার বিবাহ দেওয়া ছাড়া মণীশের কোন উপায় থাকিবে না?

ভাবিলেও ত্রিষ্টুপের মাথা ঝিম-ঝিম করে, গলা শুকাইয়া যায়। দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া সে নির্জন ঘরে, জরাজীর্ণ ট্রামে বাসে, নিজের সঙ্গে লড়াই করে। না, এতে কোন দোষ নাই। তার উদ্দেশ্য তো খারাপ নয়, সে তো বিবাহ করিবে কুন্তলাকে। আর কোন উপায় যখন নাই, এ উপায়টি বর্জন করা কাপুরুষতা।

শিশির নামে ত্রিষ্টুপের একজন বন্ধু ছিল, পাড়াতেই বাড়ী। বাড়ীর সকলে দেশে গিয়াছে, বাড়ীটা খালি। শিশির কেবল বাড়ীতে থাকে, খায় মেসে।

শিশিরের আপিস যাওয়ার সময়ে ত্রিষ্টুপ একদিন সদরের তালার চাবিটা চাহিয়া রাখিল।

'কেন?'

'কাজ আছে।'

আড্ডা?' শিশির হাসিতে হাসিতে আপিস চলিয়া গেল।

দুপুরবেলা ত্রিষ্টুপ গেল মণীশদের বাড়ী। মণীশও বাহিরে যাইতেছিল, ত্রিষ্টুপের মুখ দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার জ্বর হয়েছে নাকি তিষ্টু?'

ত্রিষ্টুপ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'না—সাবান দিয়েছি, তাই চুল উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছে।'

'চুল তোমার বেশ চকচক করছে, টেরি ভাঙ্গেনি। মুখ শুকনো দেখাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে তুমি বড় অভিমানী, বড় একগুঁয়ে না?'

'ছিলাম একটু। এখন ভাল ছেলে হয়ে গেছি। কুন্তলাকে নিয়ে যেতে এসেছি মনিদা।'

মণীশ এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করে। প্রসন্ন শান্ত দৃষ্টিতেই সে ত্রিষ্টুপের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কিন্তু চোখে তার একটু সময়ের জন্য কঠিন প্রশ্ন উঁকি দিয়া যায়।

'নিয়ে যাও।'

ডাকিলেই কুন্তলা আসিল। তাকে দেখিয়াই ত্রিষ্টুপের মুখ একেবারে বিমর্ষ পাংশু হইয়া গেল, কেহ লক্ষ্য করিল কিনা, জানা গেল না।

'তিষ্টু তোমাকে ওদের বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছে কুন্তী।'

'এখন ?'

'তাই তো বলছে তিষ্টু।'

'যাব ?'

কুন্তলার এই একটি প্রশ্নে, মণীশের কাছে অনুমতি চাওয়ায়, ত্রিষ্টুপের বিবর্ণ মুখ চোখের পলকে রাঙা হইয়া গেল। কুন্তলার প্রশ্নের জবাব না দিয়া, মণীশ তার মুখের দিকে চাহিয়া আছে খেয়াল করিয়া, জোরে সে নীচের ঠোঁট কামাড়াইয়া ধরিল।

মণীশ তখন বলিল, 'যা।'

কুন্তলা বলিল, 'চলুন যাই।'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'রিক্সা ডাকি ?'

'রিক্সা কি হবে ?'

'কাপড় বদলে এস তবে। আমি বসছি।'

'কাপড় বদলাতে হবে না। চলুন।'

মণীশ বাহিরে যাইতেছে, সে যদি তাদের সঙ্গ নেয় ? মণীশ চলিয়া যাওয়ার খানিক পরে তাদের বাহির হওয়া দরকার।

'একগ্লাস জল দেবে কুন্তী ?

'দিই।' কুন্তলা জল আনিতে গেল।

'মনিদা, আমি একটু বিশ্রাম করে—'

মুখ ফিরাইয়া ত্রিষ্টুপ দেখিল—মণীশ কখন বাহির হইয়া গিয়াছে, সে টেরও পায় নাই।

শিশিরদের বাড়ীর সদর দরজায় ত্রিষ্টুপ তালা দিয়া যায় নাই, দরজা খোলাই ছিল। কুন্তলা ভিতরে গেলে ত্রিষ্টুপ দরজা বন্ধ করিল। কুন্তলা একথা সেকথা বলিতেছিল, তার যেন মুখ খুলিয়া

গিয়াছে। সংক্ষেপে সায় দিতে গিয়াও ত্রিষ্টুপের গলায় আটকাইয়া যাইতেছিল। সব কেমন অবাস্তব, স্বপ্নের মত মনে হইতেছে, অথচ বাস্তবতার অনুভূতির চাপে প্রাণটা তার হাঁস-ফাঁস করিতেছে। নিজেকে কত বার এই পরিস্থিতিতে ধীর স্থির আত্মপ্রতিষ্ঠ বীরের মত সে কল্পনা করিয়াছে, কুন্তলার কাল্পনিক আর্তনাদে পর্যন্ত সে বিচলিত হয় নাই, সঙ্কল্পে অটল থাকিয়াছে। কুন্তলাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে ঢুকিবার আগে হইতেই যে, তার হৃদয়-মন এমন অবাধ্যপণা আরম্ভ করিবে, কে জানিত!

উপরে শিশিরের দাদার শোবার ঘরে সে কুন্তলাকে লইয়া গেল। ঘরে বসিবার ব্যবস্থাও ছিল, খাটে বিছানাও পাতা ছিল। পাশাপাশি বালিশ পাতা। নবপরিণীতা স্বামীস্ত্রীর সেই শয্যার দিকে চাহিয়া ত্রিষ্টুপ যেন চমকিয়া গেল। কুন্তলার পিছু পিছু সবে সে ঘরের ভিতরে পা দিয়াছিল, হঠাৎ নিঃশব্দে বাহির হইয়া বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুন্তলা ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ত্রিষ্টুপকে ডাকিল না, কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না।

কুন্তলার এই নীরবতাই শেষ পর্য্যন্ত ত্রিষ্টুপকে ভিতরে টানিয়া আনিল।

'এটা আমাদের বাড়ী নয় কুন্তী।'

'জানি।'

কুন্তলা আবার বলিল, 'আপনাদের বাড়ী আমি চিনি।'

'তবে এলে কেন?'

'দাদা আসতে বললেন।'

ত্রিষ্টুপ একটা চেয়ার টানিয়া কুন্তলার মুখোমুখি বসিল।

'এ বাড়ীতে কেউ নেই জান?'

'জানি।'

'তবে যে এলে?'

'বললাম তো দাদা আসতে বললেন।'

ত্রিষ্টুপ এবার চটিয়া গেল। 'দাদা! দাদা! দাদা! তোমার মত এমন দাদাভক্ত কখনও দেখিনি কুন্তী।'

কুন্তলা একটু হাসিল।

ত্রিষ্টুপ আরও চটিয়া গেল।—'তোমায় এখানে কেন এনেছি জান? বিয়ে করব বলে। দরকার হলে জোর করে' বিয়ে করব বলে। বুঝতে পারছ সেটা কি?'

কুন্তলা মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, দাদা বলছিল, আপনি ভয়ানক একগুঁয়ে।'

ত্রিষ্টুপ ক্লিষ্ট জ্বালাভরা হাসি হাসিল।—'একগুঁয়ে? তোমার দাদা তাই জানে। একগুঁয়ে হলে, এত করে' তোমাকে এখানে এনে মত বদলাতাম না কুন্তী। আমার এতটুকু মনের জোর নেই। তোমাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছি।'

'ছেড়ে না দিলে কি হত?'

'আমাকে বিয়ে করা ছাড়া তোমার কোন উপায় থাকত না। মণিদাকেও বাধ্য হয়ে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে হত।'

কুন্তলা মুখ নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'আপনি দাদাকে জানেন না।' ত্রিষ্টুপ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, 'বল কি! আজ আমাদের আসল বিয়েটা হয়ে গেলেও, তোমার দাদা সামাজিক বিয়ে দিতেন না? বেশ, বেশ! তারপর তোমার দাদার পছন্দ-মত বরের সঙ্গেই বিয়ের আয়োজন হলে, তুমিও বোধ হয় দাদার আজ্ঞা মাথায় ক'রে রাজী হয়ে যেতে?'

'দাদা আপনাকে চেনেন, তাই আমাকে আসতে দিয়েছেন। দেখছেন তো দাদার ভুল হয় নি?'

ত্রিষ্টুপের সমস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া মণীশের বিরুদ্ধে একটা দুঃসহ ক্রোধে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কুন্তলার কথায় তার মাথা খারাপ হইয়া গেল।

'ভুল হয়নি? আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি ভুল হয়েছে কিনা!'

কুন্তলার হাত ধরিয়া সে হিড়হিড় করিয়া বিছানার কাছে টানিয়া লইয়া গেল। নিজে বসিয়া দু'হাতে তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তখন সে অনুভব করিল, কুন্তলার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা টিপ্-টিপ্ করিতেছে। এতক্ষণ পরে কুন্তলার মুখ একটু বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তার চোখে দেখা দিয়াছে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি!

'ভুল হয়নি মনিদার?'

'না।'

কুন্তলার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ধীরে ধীরে ত্রিষ্টুপের হাতের বন্ধন আল্‌গা হইয়া আসিল। কুন্তলা ইচ্ছা করিলেই সরিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু ত্রিষ্টুপ সম্পূর্ণরূপে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত সে নড়িল না।

'আমি হার মানলাম কুন্তী, মনিদার ভুল হয়নি।'

'সংস্কার কি এত সহজে জয় করা যায়?'

'সংস্কার নাকি?'

'অসহায়ের ওপর দরদ আপনার রক্তে মিশে আছে।'

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করিয়া রহিল।

'চল তোমায় দিয়ে আসি কুন্তী!'

'চলুন।'

কিন্তু কেউ উঠিল না, দু'জনেই যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল। ত্রিষ্টুপ সহজ সুরে বলিল, 'আমাকে ক্ষমা কর। জীবনে অনেক কিছু আদায় করব বলে ছকেছিলাম তার মধ্যে প্রথম ছিলে তুমি। প্রথমটাতেই ব্যর্থ হব?—ভাবলেই মনে হচ্ছিল সমস্ত জীবনটাই তা'হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর কোন উপায় ছিল না, তাই এই খাপছাড়া উপায়টা দিয়ে চরম চেষ্টা করব ভেবেছিলাম। অন্য উপায় থাকলে—'

'অন্য উপায় তো ছিল!'

'ছিল কি উপায় ?'

'আদায়ের যে ছক করেছিলেন সে বদলে ফেল।'

'তাতে কি হত ?'

'দাদা রাজী হতেন। আপনি ঠিক করেছেন বড় হবেন। টাকা-পয়সা, মানসম্ভ্রম, এসব নিয়ে যারা বড় হয়, দাদার কাছে তাদের কোন দাম নেই। আপনি একগুঁয়ে মানুষ, যা, ধরবেন তা' ছাড়বেন না। একদিন মস্ত লোক হবেন, মোটর হাঁকাবেন, দেশ জুড়ে' খ্যাতি লাভ করবেন—এই আপনার প্রতিজ্ঞা। আপনার সঙ্গে আমার কখনও বিয়ে হয় ?'

'কেন ?'

'আমাদের ছক আলাদা। আমরা অন্য প্রতিজ্ঞা করেছি—জীবন দিয়ে কি আদায় করব।'

'কি আদায় করবে ?'

'স্বাধীনতা।'

ত্রিষ্টুপ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল 'ও !'

কুন্তলা ব্যগ্রভাবে বলিল, 'বুঝতে পারছেন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে কেন অসম্ভব ? আপনি যা' চান, সে সব আদায় যারা করেছে, তারা হল এক জাত ; আর তাদের পায়ের নিচে যারা চ্যাপ্টা হয়ে মরছে, তারা হল আর জাত। আমরা ওই জাতের। বেজাতের হাতে দাদা কখনও বোনকে দিতে পারে ?'

'কেরাণীরা তো তোমাদের স্বজাত ? তোমার দিদিকে তো কেরাণীর হাতে দেওয়া হয়েছে। আমিও কেরাণী।'

কুন্তলা আচল দিয়া মুখ মুছিল, তারপর হাসিল।—'কেরাণীর কোন জাত নেই। জামাইবাবু আমাদের জাতের লোক পেটের জন্য কেরাণীগিরি করছেন। জামাইবাবু দু'বছর পরে এই সেদিন ফিরেছেন, জানেন না ?'

ত্রিষ্টুপ জানিত না। কিই বা সে জানিত ? আশী টাকার

কেরাণী ও রমলার ঘরে আনন্দের ছড়াছড়ি দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। মণীশকে সে ভাবিয়াছিল খাপছাড়া রহস্যময় মানুষ! কুন্তলাকে সে ধরিয়া রাখিয়াছিল আত্মচেতনাহীন সৃষ্টিছাড়া পরবশ মেয়ে! জীবনাদর্শ কত সহজ ও কত স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এসবের! ত্রিষ্টুপ খাট ছাড়িয়া কুন্তলার কাছে গিয়া বসিল।

'তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব কুন্তী। আমার প্রথম আদায় ফস্কে গেল, ছকটাও ওলট-পালট হয়ে গেল। আমি যদি নতুন ছক কাটি, যদি তোমাদের জাতে উঠতে চাই। মনিদা রাজি হবেন?'

'নিশ্চয়। কিন্তু মত বদলানো বড় কঠিন।'

'সে আমি বুঝব। তুমি রাজি হবে?'

'দাদা রাজি হলে—'

ত্রিষ্টুপ অসহিষ্ণুর মত বাধা দিয়া বলিল, 'তোমার নিজের কথা বল। মনে কর তোমার আর আমার জীবনের আদর্শের একচুল তফাৎ রইল না। তখন যদি মনিদাকে বলার আগে তোমাকে বলি, মনিদাকে জিজ্ঞেস না ক'রেই তুমি তোমার মত জানাবে?'

কুন্তলা বলিতে গেল, 'ওসব যদি টদির কথা-

ত্রিষ্টুপ প্রায় ধমক দিয়া বলিল, 'যদির কথাই বল। রাজী হবে

'হব